সর্বস্তরে বিজ্ঞান চেতনার প্রসার

ISSN 2582-5674
RNI : WBBEN/2003/11192

বিজ্ঞান অন্বেষক

বর্ষ -২১ সংখ্যা-৪
জুলাই-আগস্ট : ২০২৪
মূল্য : ২০ টাকা

www.bigyananneswak.org.in
whts : 7980121478/9143264159

ভোজ্য তেল



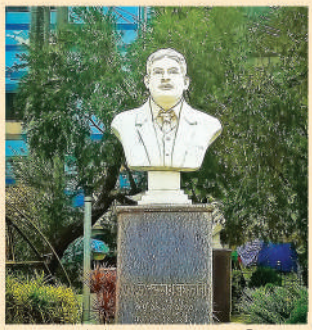




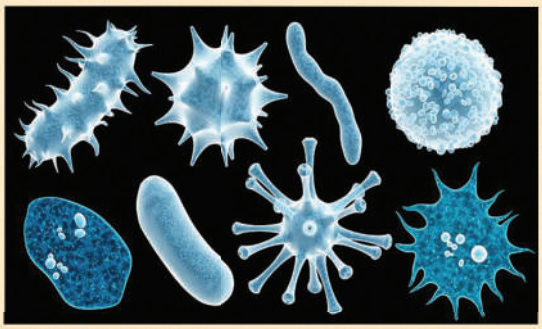








ডা. ইউ. এন. ব্রহ্মচারী



ভাইরাসের রূপভেদ



ইন্ডিয়ান উল্ফ



জেরি ডারেল

এই সংখ্যায়

❑ ভোজ্য তেলের গল্প ❑ ডা. ইউ. এন. ব্রহ্মচারী ❑ ভাইরাস ❑ এক দুই তিন...অনেক ❑ জেরি ডারেল ❑ নীহারিকা ❑ পরিবেশ দিবস ❑ চোখের আলোয় দেখে ওরা চোখের বাহিরে ❑ অংক : দিগন্ত দর্শন ❑ গ্লোবাল ডিমিং ❑ বাঁশগাছ ❑ কি খাচ্ছি? মশলা না বিষ? ❑ আটার ভুসি কেন খাবেন? ❑ হীরের তারা লুসি ❑ দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান ❑ স্বর্ণলতা ❑ জানো কি? ❑ চিঠিপত্র প্রতিবেদন ❑ পিটার হিগস্ ❑ বিজ্ঞান সংবাদ ❑ যারা হারিয়ে যাচ্ছে : নিশাচর প্রাণী

পল্লব রায় গুপ্ত

বিজ্ঞান সংবাদ

স্বপ্ন চুরি



বিজ্ঞানী গ্যাব্রিয়েল মিন্ডলিন

২০১০ সালের ক্রিস্টোফার নোলানের পরিচালিত 'ইন্সেপসন' ছবিটি হয়ত অনেকেই দেখেছেন। ছবিতে, নায়ক মানুষের স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চুরি করতো। কিন্তু, সেটা তো ছিল সিনেমা। বাস্তবে কি এমনটা হয় নাকি? ইউনিভারসিটি অফ বুয়েনস্ আইরেসের একদল বিজ্ঞানী পাখির স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন আর স্বপ্নের মধ্যে পাখিটির গান গাওয়া শুনে ফেলেছেন। এই গবেষণার পুরোধা হলেন মেসির শহরের বিজ্ঞানী গ্যাব্রিয়েল মিন্ডলিন। কিছু পাখি গভীর ঘুমে গান অনুশীলন করে আর সেই সময় তাদের কণ্ঠের পেশী গুলো নড়াচড়া করে। তার সাথে পাখির মস্তিষ্কে চলে নিউরাল সিগন্যালের খেলা। বিজ্ঞানীর দলটি পাখিটির পেশীর সঞ্চালনার ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল গুলো রেকর্ড করেছেন এবং সেই সিগন্যাল গুলোকে শব্দে পরিবর্তিত করে ফেলেছেন। সেই সাথে পাখির মস্তিষ্কের নিউরাল সিগন্যালের সাথে গলার পেশী সঞ্চালনার এক যোগসূত্র স্থাপন করেছেন বিজ্ঞানী মিন্ডলিনের দল। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ আগামী দিনে আমাদের ভাষা শেখার বিজ্ঞানকে বুঝতে সাহায্য করবে এবং স্বপ্নের বিজ্ঞানকেও আরও গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে।

মেরু জ্যোতি



মে মাসের ১০ ও ১১ তারিখে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার আকাশে হল মহাজগতিক হোলি খেলা। অরোরা বোরিয়ালিস বা মেরু জ্যোতি আগে শুধু মাত্র মেরু প্রদেশ বা তার আশপাশের অঞ্চলেই দেখা যেত। উৎসাহী সাধারণ মানুষ টাকা জমিয়ে প্রকৃতির এই অত্যাশ্চর্য রঙের খেলা দেখতে আলাস্কা যেতেন। কিন্তু সেই আলোর খেলা এবার দেখা গেলো সারা পৃথিবীর বিভিন্ন শহর সহ আমাদের দেশের লাদাখ থেকেও। লক্ষ লক্ষ ক্যামেরায় ধরা পড়ল আকাশ জুড়ে লাল, সবুজ, বেগুনী আরও কত রঙের খেলা। কিন্তু অ পূর্ব সুন্দর এই আলোর নাচনের পিছনে রয়েছে ভয়ঙ্কর এক ঘটনা-সৌরঝড়। সূর্যের মধ্যে প্লাজমার দৌড়াদৌড়ি অনেক সময়ে খুব বেড়ে গেলে সেই সব প্লাজমা বা শক্তিশালী চার্জড কণারা পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে। পৃথিবীর চারপাশে থাকা চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সাথে সেই সব কণার সংঘর্ষে তৈরি হয় মহাজাগতিয় আলোর খেলা। সূর্য থেকে ছিটকে আসা এই সব কণারা এতটাই শক্তিশালী হয় যে তারা নিমেষে ধ্বংস করতে পারে ইলেকট্রিক্যাল গ্রিড এবং পৃথিবীর চারপাশে পাক খাওয়া বিভিন্ন স্যাটেলাইটস যা সমস্ত কমিউনিকেশন ব্যাবস্থাকে এক ধাক্কায় নষ্ট করে দিতে পারে যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হতে পারে বিলিয়ন ডলার। কথায় বলে ভয়ঙ্কর সুন্দর। এই ঘটনা যেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

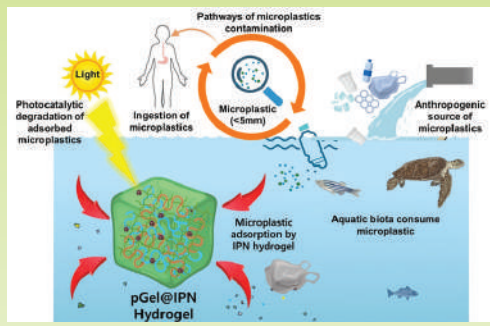
বন্ধু পঙ্গপাল



পঙ্গপালের সাহায্যে বাবানো রোবট (সূত্র-ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি)

পঙ্গপাল হল পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষতিকারক পতঙ্গ। পঙ্গপালের ঝাঁক ফসল খেয়ে কোন একটা দেশে দুর্ভিক্ষ পর্যন্ত আনতে পারে। এহেন পতঙ্গ যে কোন উপকারে লাগতে পারে এটা ভাবতেই অবাক লাগে। বিজ্ঞানীরা পঙ্গপালের ঘ্রানশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বানাচ্ছেন রোবট। সেই সব ছোট্ট রোবট গুলো সহজেই ধরে ফেলতে পারে বিস্ফোরকের অস্তিত্ব, রাসায়নিক উপাদানের গরমিল। শুধু কি তাই, এহেন সেন্সর গন্ধ শুঁকে ধরে ফেলতে পারে মানুষের শরীরে কোন মারণ রোগ বাসা বেঁধেছে কিনা। ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির একদল বিজ্ঞানী (ভারতীয়) গবেষণা করে দেখেছেন পঙ্গপালের সূদ শুঁড় বা অ্যান্টেনাতে রয়েছে অসংখ্য গন্ধের সেন্সর, যার সাহায্যে অতি ম্লান কোন গন্ধকেও সহজেই অনেক দূর থেকে অনুভব করতে পারে পঙ্গপালের দল। সেই অ্যান্টেনাকেই কাজে লাগিয়ে ওয়াশিংটনের বিজ্ঞানীরা বানিয়ে ফেলেছেন বম্ব বা বিস্ফোরক ধরার সেন্সর যা যেকোনো জায়গায় সহজেই ঢুকে পড়ে গন্ধ শুঁকে বিপদের আঁচ দিতে পারবে। গল্পটা পড়ে কি সুকুমার রায়ের গন্ধ বিচার ছড়াটার কথা মনে পড়ল কি কারো?

মাইক্রো প্লাস্টিকের শত্রু



হাইড্রোজেল মাইক্রো প্লাস্টিককে ধ্বংস করে। সূত্র-II

আমরা অনেকেই হয়তো প্লাস্টিকের বোতলে জল খাই। সাগর, নদী, পুকুর সবেতেই রয়েছে প্লাস্টিক। আর এই সব প্লাস্টিক থেকেই অসংখ্য মাইক্রো প্লাস্টিক মিশে যাচ্ছে জলে। এমনকি বোতলে রাখা পানীয় জলের বোতল থেকেও। আমাদের অজান্তেই হয়তো আমরা খেয়ে ফেলছি অজস্র এমন মাইক্রো প্লাস্টিক, রোজ। যা ক্রমশ আমাদের মারণ রোগের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স, ব্যাঙ্গালুরুর এক গবেষণাকারী দল সম্প্রতি এক জৈব রাসায়নিক হাইড্রোজেল বানিয়েছেন যা জলে থাকা মাইক্রো প্লাস্টিককে ধ্বংস করতে প ারে। এই গবেষণার পুরধায় রয়েছেন বিজ্ঞানী সূর্যসারথি বোস। তিনি ও তাঁর দল যে রাসায়নিক বানিয়েছেন তা প্রথমে জলে মিশে থাকা অতি সূদ প্লাস্টিকগুলোকে খুঁজে বের করে। তারপর, আলোর অতিবেগুনী রশ্মিকে কাজে লাগিয়ে জলের মাইক্রো প্লাস্টিককে ধ্বংস করে। এমন আবিষ্কার আজকের অতিমাত্রার দূষিত পৃথিবীতে যেন আশার আলো দেখায়।

email: physics.pallab@gmail.com • M. 9681021007

বিজ্ঞান অন্বেষক

সম্পাদক

প্রবীর বসু

সম্পাদকমণ্ডলী

জয়দেব দে, বিজয় সরকার, শিবপ্রসাদ সরদার, চন্দনসুরভি দাস, দীপাঞ্জন দে, অমিতাভ চক্রবর্তী, অনিন্দ্য দে, রতন দেবনাথ, পান্না মানি, অনুপ হালদার, সুবিনয় পাল, তুষার কান্তি নাথ, শতাব্দী দাশ, সোমা বসু, অর্চন সমাজদার, উজ্জ্বল কান্তি রায়, রিঙ্কু দাস, মোহা: গোলাম হামজা (রাহুল), কিঞ্জল বিশ্বাস

উপদেষ্টামণ্ডলী

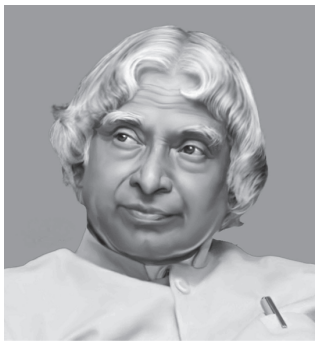
শঙ্করকুমার নাথ, দীপককুমার দাঁ, সিদ্ধার্থ নারায়ণ জোয়ারদার, বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, প্রকাশ দাস বিশ্বাস, রাজা রাউত, তপন দাস, মানসপ্রতিম দাস, সুমিত্রা চৌধুরী, জয়শ্রী দত্ত, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, তপন সাহা, সৌমেন বিশ্বাস, সমীর নাগ

: website :
www.bigyananneswak.org.in/
ssu2011.com/bigyananneswak
e-mail :
bigyanannesak1993@gmail.com.
Mobile & Whatsapp No.
9830676330 / 9143264159/7980121478

প্রচ্ছদ বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা

টিম বিজ্ঞান অন্বেষক

সুভাষিতম



আবদুল কালাম

জন্ম : ১৫.১০.১৯৩১ মৃত্যু : ২৭.০৭.২০১৫

Dream, dream, dream.....
Dreams transform into thoughts,
And thoughts result in action.
–APJ Abdul Kalam

স্বপ্ন, স্বপ্ন, আর স্বপ্ন.....
স্বপ্নই রূপান্তরিত হয় চিন্তায়,
আর চিন্তার পরিণতিই হল কাজ।
—এপিজে আবদুল কালাম

আমাদের কথা

উত্তপ্ত পৃথিবী



উত্তপ্ত হচ্ছে বসুন্ধরা। পৃথিবীপৃষ্ঠকে কমলালেবুর খোসার মত ঢেকে রেখেছে যে বায়ুমন্ডল, তার উষ্ণতা বৃদ্ধি এক স্বাভাবিক ঘটনা, যা জীবমন্ডলের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু উষ্ণতা বৃদ্ধির হার যখন অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে তখন তা সভ্যতার জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে পড়ে।

অস্বাভাবিক পরিবেশ দূষণের ফলে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। হিসাব অনুসারে পৃথিবীর উষ্ণতা ১.৫ থেকে ২° সেলসিয়াস, বাড়তে সময় লাগে ১০০০ বছর। অথচ গত ৫০ বছরে তাপমাত্রা বেড়েছে ০.৫° সেলসিয়াস। বিজ্ঞানীরা মনে করেন পৃথিবীর যে তাপমাত্রা হওয়া উচিত বর্তমানে তার থেকে ৩৩% বেশি।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য দিন দিন যেভাবে বিনষ্ট হচ্ছে তাতে সভ্যতার অস্তিত্বই বিপন্ন হবার উপক্রম। পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশঃ বেড়ে যাওয়া ও অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় উপমহাদেশে ভূমিকম্প, বন্যা, ক্ষরা, অনাবৃষ্টি এমনকি সুনামীর মত বিপর্যয় যে কোনো মুহূর্তে নেমে আসতে পারে। বিশেষ করে হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলে হিমবাহের তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। হিমবাহ প্রতি বছরে ১০ থেকে ১৫ মিটার সরে আসছে। আশঙ্কা ২০৫০ সালের মধ্যেই সুমেরুর বরফ পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বরফে ঢাকা অঞ্চলের আয়তন এত দিন ছিল ৫.৯ মিলিয়ন স্কোয়ার মিটার। মাত্র এক দশকের মধ্যে এই বিশাল বরফ সাম্রাজ্যের আয়তন কমে দাঁড়িয়েছে ১.৯ মিলিয়ন স্কোয়ার মিটার। আবার গ্লেসিয়ার গলে যাওয়ায় পাহাড় নিঃসৃত নদীগুলিতে জলের পরিমাণ অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়ে নিম্নভূমিতে বিপন্ন হতে চলেছে মানবসভ্যতা।

কাজেই দেশের জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং শিল্পায়ন, বনাঞ্চল নির্মূল, গ্রীন হাউস গ্যাসের প্রাবল্য—এসবই যদি সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করা না হয়, তবে আমরা আমাদের পৃথিবীকে হারাব, সাথে সাথে আমরাও এ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব।

ISSN 2582-5674
9 772582 567004

বিজ্ঞান অন্বেষকের পক্ষে জয়দেব দে, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত এবং স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস : রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

যোগাযোগ : ৭৯৮০১২১৪৭৮/৯২৩১৫৪৫১৯১/৯৪৩২৩৩৫৮৮২/৮৯৪৪৯৯৬৭৫৫/৭০০১৩৩৭৭১৪/৮২৪০২৪৪৩২৩

সূচি

১ আমাদের কথা

সুভাষিতম
উত্তপ্ত
পৃথিবী

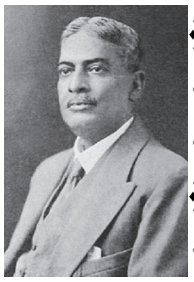


৩ ভোজ্য তেলের গল্প



ড. তপন দাস

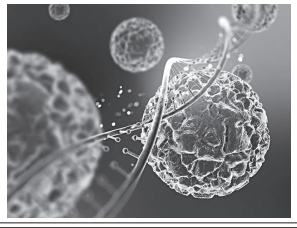
৭ ডা. উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী
রাজদীপ ভট্টাচার্য



৯ সংবাদ



১০ প্রচ্ছদ কথা
ভাইরাস : বিশ্বাস, বিসম্বাদ, বিজ্ঞান
সন্দীপন তালুকদার
রাজর্ষি ঘোষ



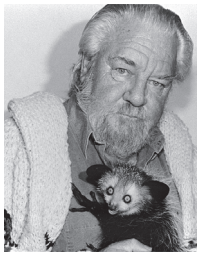
১৫



এক দুই তিন.....
অনেক

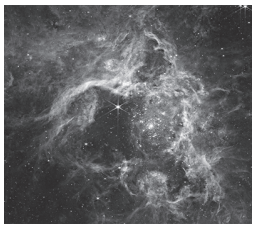
ড. অমিতাভ চক্রবর্তী

১৭
প্রাণী বিজ্ঞানী
জেরি ডারেল



ডা. সুকান্ত মুখোপাধ্যায়

১৯ মহাকাশ
উর্ণনাভ
নীহারিকা
তন্ময় ধর



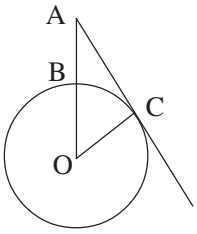
২০ পরিবেশ দিবস
অজয় নাথ



২১ চোখের আলোয় দেখে ওরা চোখের বাহিরে
সৌম্যকান্তি জানা



২৩ অংক
দিগন্ত দর্শন
ড. গোপালকৃষ্ণ গাঙ্গুলি



২৪ গ্লোবাল ডিমিং
প্রবীর বসু



২৫
স্বর্ণলতা
ড. সৌমিত্র চৌধুরী



২৬ বাঁশগাছ
জিৎ মণ্ডল



২৬ সংবাদ

২৭ কি খাচ্ছি? মশলা না বিষ?
অসীম বসাক



২৮ হীরের তারা লুসি
শামীম হক মণ্ডল



২৯ চিঠি-১
২৯ দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান

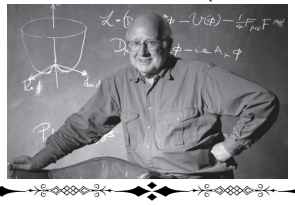
৩০ খাবার নিয়ে ভাবুন
আটার ভুসি কেন খাবেন?
প্রবীর বসু



৩০ চিঠি-২

৩১ জানো কি? রিঙ্কু দাস
পত্র প্রতিবেদন : সন্তোষ সেন

৩২ বিজ্ঞানী পিটার হিগস্
ড. অমিতাভ চক্রবর্তী



২য় প্রচ্ছদ : বিজ্ঞান সংবাদ
পল্লব রায় গুপ্ত

৩য় ও ৪র্থ প্রচ্ছদ : যারা হারিয়ে যাচ্ছে
(নিশাচর)
ড. রাজা রাউত



প্রচ্ছদ কথা ১

ড. তপন দাস

ভোজ্য তেলের গল্প

কাঁচা খাবার ছেড়ে আগুনের ব্যবহার শিখে মানুষের অভ্যাস হল পোড়া মাংস খাওয়ার। ভোজন রসিক মানুষ খুঁজতে শুরু করল খাবারকে সুস্বাদু করে তোলার নতুন নতুন উপায়। রন্ধন প্রণালীতে যুক্ত হল বিভিন্ন রকমের ভোজ্য তেল। প্রাচীনকাল থেকেই উদ্ভিজ্জ তেলগুলো যে শুধুমাত্র রান্নায় ব্যবহৃত হতো তা নয়, বিভিন্ন প্রসাধনী বানাতে, শরীরকে শক্ত সামর্থ্য করে তুলতে, বাতি জ্বালাতে, যন্ত্রে পিচ্ছিলকারক হিসেবে ব্যবহার শুরু করেছিল মানুষ। বিভিন্ন সভ্যতায় কিছু কিছু তেলের ব্যবহার জড়িয়ে আছে তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে। কিছুক্ষেত্রে খাদ্য সামগ্রী সংরক্ষণের জন্যও উদ্ভিজ্জ তেলের ব্যবহার শিখেছে মানুষ। প্রাচীন বিভিন্ন সভ্যতায় জলপাই বা অলিভ তেল, তিলের তেল, সরিষার তেল, সূর্যমুখীর তেল সহ বেশ কিছু উদ্ভিজ্জ তেলের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। যুগে যুগে এর ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন সভ্যতায়। আজকাল ভুট্টার বীজ এমনকি ধানের তুস নিঃসৃত তেলও ভোজ্য তেলের তালিকায় স্থান পেয়েছে।

ভূমধ্যসাগরের সেরা জলপাই তেল

প্রাচীন গ্রিক, রোমান এমনকি ভূমধ্যসাগরীয় রন্ধন শৈলীতে দীর্ঘদিন ধরেই জলপাই তেল ব্যবহার হয়ে আসছে। খ্রিষ্টের প্রায় ৪০০০ বছর পূর্বেই জলপাই তেলের ব্যবহার শুরু হয় বলে অনুমান করা হয়। ক্রিটে বন্য জলপাইকে চাষে পরিণত করেছিল মিনোয়াম যুগের শেষের দিকে।



ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মনোরম জলবায়ুতে জলপাই চাষ শুরু হয় প্রচুর পরিমাণে। আধুনিক জলপাই গাছ প্রাচীন পারস্য এবং মেসোপটেমিয়া থেকে উদ্ভূত হতে পারে বলে অনেকে মনে করলেও, কিছু পণ্ডিত মিশরীয় উৎসের পক্ষে যুক্তি দেন। গ্রিক, রোমান সভ্যতার মানুষেরাও যখন এই চাষ শুরু করল, সেই খবর গিয়ে পৌঁছালো আমেরিকানদের কানে। খ্রিস্টপূর্ব ৮ম সহস্রাব্দের প্রথম দিকে বন্য জলপাই, যার উৎপত্তি এশিয়া মহাদেশে, নিওলিথিক লোকেরা সংগ্রহ করেছিল। খাবারের পাশাপাশি, অলিভ অয়েল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, ওষুধ, তেলের বাতিতে জ্বালানি, সাবান তৈরি এবং ত্বকের যত্নে ব্যবহার করা হয়েছে। স্পার্টান এবং অন্যান্য গ্রীকরা জিমনেসিয়ায়, ব্যায়াম করার সময় নিজেদের বাহুবল বাড়াতে তেল ব্যবহার করত। ইতিহাসবিদ প্লিনি দ্য এল্ডারের মতে, ইতালিতে ১ম শতাব্দীতে যুক্তিসঙ্গত মূল্যে জলপাই তেল ছিল— 'ভূমধ্যসাগরের সেরা'। খ্রিস্টীয় ৫ম শতাব্দীতে রোমানরা জলপাইকে পেষণ করে তার থেকে তেল নির্যাসের কৌশল ব্যবহার করতে শুরু করে। কাজটাকে কিছুটা হলেও সহজ করলেন জোসেফ গ্রাহাম। ১৭৯৫ সালে তার যুগান্তকারী আবিষ্কার হাইড্রোলিক প্রেসিং সিস্টেমের বিকাশের ফলে উৎপাদনশীলতা ব্যাপকভাবে উন্নত হয়েছিল। অলিভ অয়েল জন্মনিয়ন্ত্রণের একটি রূপ হিসেবেও জনপ্রিয় ছিল। অ্যারিস্টটল তার 'হিস্ট্রি অফ অ্যানিম্যালস' গ্রন্থে গর্ভাবস্থা রোধ করতে সিডারের তেলের সাথে জলপাই তেলের মিশ্রণ প্রয়োগ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। খ্রিস্টান ও ইহুদীদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানেও জলপাই তেল ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া গির্জায় প্রদীপ জ্বালাতেও জলপাই তেলের ব্যবহারের প্রচলন ছিল।

জলপাই তেলের রাসায়নিক সংযুতি বিশ্লেষণে মূলত তিন ধরনের পদার্থ পাওয়া যায়। ১৬ থেকে ১৮টি কার্বন শৃঙ্খল ঘটিত ফ্যাটি অ্যাসিড বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবে সাধারণ ভাবে ১২ থেকে ২৪ টি কার্বন যুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড ভোজ্য তেল হিসেবে স্বীকৃত। জলপাই তেলে উপস্থিত ফ্যাটি অ্যাসিড গুলোর মধ্যে পামিটিক অ্যাসিড, ওলিক অ্যাসিড, লিনোলেইক অ্যাসিড, স্টিয়ারিক অ্যাসিড উল্লেখযোগ্য। কার্বন শৃঙ্খলে কোথাও পুরোটাই একবন্ধনে আবদ্ধ থাকে তবে কোথাও কোথাও এক বা একাধিক দ্বিবন্ধন থাকতে পারে। তিনটি করে ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লিসারলের তিনটি অ্যালকোহলিক গ্রুপের সাথে আবদ্ধ হয়ে ট্রাইঅ্যাসাইল গ্লিসারল উৎপন্ন করে। তবে কিছু ফ্যাটি অ্যাসিড মুক্ত ভাবেও থাকতে পারে। শতকরা হিসেবে অল্প হলেও জলপাই তেলের সংযুতিতে পলিফেনল এবং স্টেরল (ফাইটোস্টেরল এবং টোকোস্টেরল) পাওয়া যায়। পলিফেনল গুলির উপস্থিতি তেলের বর্ণ যেমন নির্ধারণ করে অন্য দিকে এদের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ক্ষমতাও বর্তমান এবং স্টেরলের আছে কিছু পুষ্টিগত গুণাবলী। মানুষের শরীর থেকে বাজে কোলেস্টেরল দূর করতে ফাইটোস্টেরল এবং টোকোস্টেরল গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা গ্রহণ করে। আবার অতিসামান্য পরিমাণে স্কোয়ালিনের মত হাইড্রোকার্বনের উপস্থিতিও পুষ্টিগত দিক সমৃদ্ধ করে। ১০০ গ্রাম প্রমাণ পরিমাণে, জলপাই তেল ৮৮৪ ক্যালোরি খাদ্যশক্তি সরবরাহ করে এবং এটি ভিটামিন ই এবং ভিটামিন কে (K) সরবরাহ করে। চাষ, অঞ্চল, উষ্ণতা, ফসল কাটার সময় এবং নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে গঠন পরিবর্তিত হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় অতি সামান্য পরিমাণে উপস্থিত যৌগগুলো হারিয়ে যায় এবং পুষ্টিগত মানের ব্যাঘাত ঘটে।

প্যাপিরাসের ভোজ্য তিলের তেল

খ্রিষ্টের প্রায় ১৫০০ শতাব্দী পূর্বে প্রাচীন মিশরের প্যাপিরাসে ভোজ্য তেল হিসেবে তিলের তেলের কথা পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরীয় ঔষধ শাস্ত্রের বইতেও তিলের তেলের কথা বলা হয়েছে। এর বৈজ্ঞানিক নাম সিসামাম ইনডিকাম (*Sesamum indicum*) (indicum means from India) থেকে পরিষ্কার অনুমান করা যায় তিলের আদি উৎস ভারতবর্ষ।

প্রাচীন চীন থেকে জাপান সর্বত্রই তিলের তেলের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিকভাবে, ৫০০০ বছরেরও বেশি আগে তিল একটি খরা-সহনশীল ফসল হিসাবে চাষ হয়েছিল বলে প্রমাণ মিলেছে। সিন্ধু সভ্যতার সময় তিল চাষ করা হত এবং প্রধান তেল ফসল ছিল। এটি সম্ভবত ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মেসোপটেমিয়ায় রপ্তানি করা হয়েছিল।



একটা সময় বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবেও তিলকে ব্যবহার করা হতো।

বাড়ির সামনে দিয়ে ফেরিওয়ালা "তিলের খাজা চাই, তিলের খাজা" হাঁক পেড়ে যাচ্ছে আর আমাদের মায়ের কাছে বায়না থাকে কিনে দেবার। বলা চলে আমাদের তিলের সাথে পরিচয় তিলের খাজা দিয়ে। তাছাড়া তিলের নাড়ু বানানোর প্রচলন আজও বাঙালীর ঘরে ঘরে বিরাজমান। অন্যদিকে হাম অথবা গুটি বসন্ত কারো শরীরে দেখা দিলে, সেই দাগ মেলানোর জন্যও তিলের তেলের জুড়ি নেই।

তিলের তেল বেশ কিছু অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের সংযুক্তিতে পুষ্ট। লিনোলেইক অ্যাসিড linoleic acid অলিক অ্যাসিড (oleic acid) পামিটিক অ্যাসিড (palmitic) স্টিয়ারিক অ্যাসিড (stearic acid) এবং সামান্য পরিমাণে লিনোলেনিক অ্যাসিড (linolenic acid) যা কিনা ওমেগা ৬ হিসেবে অধিক পরিচিত। তবে তিলের তেলের সংযুক্তিতে পলি ফেনলের উপস্থিতিও জানান দেয়। এই পলিফেনল বা অন্যান্য উৎপাদনের শতকরা পরিমাণ উৎসের স্থানভেদে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। একদিকে চাষের ভৌগোলিক অবস্থা যেমন সংযুক্তির তারতম্যের জন্যও দায়ী অন্যদিকে বীজের উপরও নির্ভর করে। যেমন কালো তিল অপেক্ষা সাদা তিলে ওমেগা ৬ এবং পলিফেনল বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য গঠনে সহায়ক বেশ কিছু উপাদান তিলের তেলে বর্তমান, যাদেরকে এক সঙ্গে লিগন্যান্স (সিসামিন, সিসামলিন, সিসামল, সিসামিনল) বলে। এদের জারণ রোধি ক্ষমতাও আছে। টোকোফেরলের উপস্থিতিই তেলের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে যার জন্যও অন্য উদ্ভিজ্জ তেলের থেকে এই তেল বেশীদিন স্থায়ী হয়। বিভিন্ন রকমের খনিজের উপস্থিতি এই তেলের গুণগত মান কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়।

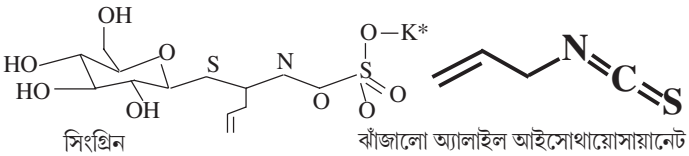
সর্ষের তেলে ঝাঁঝাল গন্ধ কেন?

বহুকাল পূর্ব থেকেই মানুষের ঘরে ঘরেই পাওয়া যেত সরিষা দানা শস্য। সরিষাকে কেন্দ্র করেও আছে বেশ কিছু মিথ। সরিষা দিয়ে ভূত ছাড়ানোর গল্প আমরা কে না জানি। আবার এই গল্পটিও সকলের পরিচিত। কিসা গৌতমী নামে এক মহিলা তার একমাত্র পুত্রকে নিয়ে বাস করতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার পুত্র মারা যায়। নিরুপায় হয়ে তিনি প্রভু গৌতম বুদ্ধের কাছে পুত্রের মৃতদেহ নিয়ে এসে পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চান। প্রভু শর্ত আরোপ করেন, পুত্রের প্রাণ তিনি ফিরিয়ে দিতে পারেন, যদি কিনা তিনি কোন বাড়ি থেকে একমুঠো সরিষা দানা এনে দিতে পারে। কিন্তু এমন বাড়ি থেকে সরিষা দানা আনতে হবে যে বাড়িতে কোনদিন মৃত্যু প্রবেশ করেনি। কিসা গৌতমী শর্তে রাজি হলেন। বেরিয়ে পড়লেন সরিষা দানার খোঁজে। প্রত্যেক গৃহস্থই তাকে সরিষা দানা দিতে রাজি হয়, কিন্তু যখনই নির্ধারিত শর্তের কথা শোনে তখনই কেউ আর সরিষা দানা দিতে সম্মত হয়না। তারা কিসাকে জানায় মৃত্যু তাদের ঘরেও প্রবেশ করেছে। নিরাশ হয়ে কিসা ফিরে আসে বুদ্ধের কাছে। বুদ্ধ বোঝাতে সক্ষম হয় যে মৃতের প্রাণ ফেরানো কখনই সম্ভব হয়না। এর মধ্যদিয়ে বুদ্ধ বুঝিয়ে দেন জীবনে পথ চলায় কঠিন বাধাকে অতিক্রম করতে হবে,



শোক ভুলে ফিরতে হবে ছন্দে। এই গল্প অন্যদিকে প্রমাণ করে সেই সময়কার জীবনযাত্রা। তখনকার জীবন যাপনে সরিষার প্রচলন প্রত্যেক ঘরেই বিরাজমান ছিল একথা বলাই বাহুল্য।

সরষে বাটায় ইলিশ বা অন্য কোন মাছ বাঙালীর একটি লোভনীয় খাবার। ফিস ফ্রাইয়ের সাথে একটু কাসুন্দি না হলে ঠিক যেন জমে না। তাছাড়া আচারের বয়ামে মাঝে মাঝে সরিষার তেল তো দিতেই হবে। সরিষার প্রায় ৩০% তেল তৈরি করে। এটি কালো সরিষা (*Brassica nigra*), বাদামী সরিষা (*B. juncea*), এবং সাদা সরিষা (*B. alba*) থেকে উৎপাদিত হতে পারে। সর্ষের তেলের ঝাঁঝের কারণ অ্যালাইল আইসোথায়োসায়ানেট নামক একটি উদ্বায়ী গন্ধকযুক্ত রাসায়নিক যৌগ। সর্ষের তেল জলের সংস্পর্শে এলেই তাতে ঝাঁজ হয়। তাজা সর্ষের তেলে অ্যালাইল আইসোথায়োসায়ানেট থাকে না, থাকে সিংগ্রিন নামে তার গ্লুকোসিনোলেট যৌগ। জল বা অ্যাসিডের সাথে মিশ্রণ বা আলোড়নের ফলে মাইরোসিনেজ নামে একটি উৎসেচক সক্রিয় হয়ে সিংগ্রিন থেকে গ্লুকোজ আলাদা করে দিয়ে ঝাঁজালো অ্যালাইল আইসোথায়োসায়ানেট তৈরি করে।



সিংগ্রিন ঝাঁজালো অ্যালাইল আইসোথায়োসায়ানেট

সরিষার তেল সম্ভবত আধুনিক ইজরায়েলের প্রাচীন ইহুদি শহর হকক-এ উৎপাদিত হত। পণ্ডিতরা বিশ্বাস করেন যে রোমান বা বাইজেন্টাইন যুগের বিশেষ কাঠামো তেল তৈরির জন্য সরিষার শুঁটি গুঁড়ো করতে ব্যবহৃত হত। ভারতীয় উপমহাদেশে খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ থেকে সর্ষের ব্যবহার হয়ে আসছে। সর্ষের তেল উদ্দীপক হিসেবে পরিচিত। অন্ত্রে পাচকরস উৎপাদনে সাহায্য করায় হজম প্রক্রিয়া দ্রুত হয়। এ ছাড়া একই প্রক্রিয়ায় ক্ষুধা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বিভিন্ন ভোজ্য তেলের ওপর করা একটি তুলনামূলক সমীক্ষায় দেখা যায়, সর্ষের তেল ৭০ শতাংশ হৃৎপিণ্ড-সংক্রান্ত রোগের ঝুঁকি কমায়। সর্ষের তেল ব্যবহারে শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস পায়, যা হৃদ্‌রোগের আশঙ্কা কমিয়ে দেয়। সর্ষে তেলের পুষ্টি উপাদান, ভিটামিন, ও মিনারেল চুলের অকালপক্কতা রোধ করে থাকে। সর্ষের তেলে গ্লুকোসিনোলেট নামক উপাদান থাকে, যা অ্যান্টিকারসিনোজেনিক উপাদান হিসেবে পরিচিত। তাই এটি ক্যানসারজনিত টিউমারের গঠন প্রতিরোধে সাহায্য করে। এর ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট কোলোরেক্টাল ও গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ক্যানসার থেকে সুরক্ষাও প্রদান করে। সর্ষের তেলে প্রচুর ভিটামিন ও খনিজ থাকে। বিশেষ করে উচ্চমাত্রার বিটা ক্যারোটিন থাকে এতে। বিটা ক্যারোটিন ভিটামিন-এ তে রূপান্তরিত হয়ে চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

মায়ানদের সূর্যমুখী

বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে সূর্যমুখী ফুলের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে মনে এর আদি উৎস সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন মনে জাগে। আদি উৎসের ইতিহাস ঘাটলে পাওয়া যায়, প্রারম্ভিক দক্ষিণ আমেরিকান সংস্কৃতির ঐতিহাসিক রেকর্ড সূর্যমুখীর কথা উল্লেখ আছে। সম্ভবত মায়া সভ্যতার মায়ানরা এটিকে খাদ্যের একটি প্রাথমিক উৎস হিসাবে বিবেচনা করেছিল। যেহেতু মায়ানরা সূর্যকে পবিত্র দেবতা হিসেবে পূজা করত, তাই এই ফুলের নাম সূর্য থেকে হতে পারে। উল্লেখ্য যে ফুলটি সর্বদা সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে বলে এর নামকরণ করা হয়েছে। তারা ঔষধি গুণসম্পন্ন এই ফুলটিকে পবিত্র বলে মনে করত এবং থেরাপিউটিক উদ্দেশ্যে তেল ব্যবহার করত। এছাড়াও, সূর্যমুখী তেল দিয়ে রান্না করা সেই অংশগুলিতে একটি সম্প্রদায়ের আচার।

দক্ষিণ আমেরিকান অন্য সভ্যতা যেমন ইনকা এবং অ্যাজটেক যারা মায়ানদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ, তারাও সূর্যমুখীকে পবিত্র বলে মনে করে এবং তাদের খাবারে সূর্যমুখী তেল ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। একসময় সূর্যমুখী তেল সাপের কামড়ের প্রতিকার হিসাবে ব্যবহৃত হত। তখনকার দিনে সাপের কামড় ছিল মৃত্যুর অন্যতম কারণ। সেখানে সূর্যমুখী তেল এর জন্য চিকৎসায় ব্যবহার করা হয় তবে এটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ একথা বলাই বাহুল্য। বেশ কিছু প্রাচীন গ্রন্থেও সূর্যমুখী তেলের রেসিপির উল্লেখ পাওয়া গেছে। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সূর্যমুখী তেল ব্যবহার যে শুধুমাত্র দক্ষিণ আমেরিকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল এমনটা কিন্তু নয়। রাশিয়ায় পাওয়া প্রাচীন গ্রন্থগুলি নির্দেশ করে যে সূর্যমুখী



পাতাগুলি কাশি, বাত, ব্রঙ্কাইটিস এবং এমনকি ম্যালেরিয়ার মতো একাধিক রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হত। এই তেলকে বাণিজ্যিকীকরণের কাজটি ১৮৩০ সালে রাশিয়ানরাই প্রথম করেছিল। তবে সূর্যমুখী উত্তর আমিরিকার একটি স্থানীয় গাছ। সেখানেও এর উৎপাদন ব্যাপক পরিমাণে ছিল। ১৯ শতকে ঔপনিবেশিকতার কারণে বলা চলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এর গুণাবলী ছড়িয়ে পরে।

বীজ থেকে তেল নিষ্কাশনের পদ্ধতিও একেবারে সহজ নয়। প্রথমে আবাদ করা ফসল শুকানোর জন্য জমিতে শুকানো হয়। এরপর তেল নিষ্কাশনের উপযোগী করে কোল্ড প্রেস পদ্ধতিতে, তেল বের না হওয়া পর্যন্ত বীজগুলিকে ধীরে ধীরে এবং স্থিরভাবে চেপে রাখা হয়। ঘর্ষণ দ্বারা উৎপাদিত তাপে বীজগুলিকে একসাথে পিশে ধরা হয়। তেলের উচ্চ গুণমান নিশ্চিত করতে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রক্রিয়াটি শেষ হয়ে গেলে, বোতলজাত করার আগে অতিরিক্ত সূক্ষ্ম কণা অপসারণের জন্য তেলটি অবশ্যই ফিল্টার করতে হবে।

প্রকৃত তেলের ফলন নির্ভর করে ভৌগোলিক কারণের (মাটি, আবহাওয়া), বীজের গুণাগুণ, নিষ্কাশন পদ্ধতি ইত্যাদির উপর। সূর্যমুখী তেলের ১০০ গ্রাম বীজ থেকে প্রায় ৪২ গ্রাম হতে পারে। সূর্যমুখী বীজে ৫০% পর্যন্ত ট্রাইগ্লিসারাইড তেল এবং ২০% পর্যন্ত প্রোটিন থাকে। তেলে অল্প পরিমাণে মোমও থাকে। উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভিটামিন, খনিজ সূর্যমুখীর বীজে পাওয়া যায়। এছাড়াও টোকোফেরল (ভিটামিন ই) রয়েছে। সূর্যমুখী তেল ওমেগা ৬ ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ। সূর্যমুখী তেলে সাধারণত প্রায় ৬৯% লিনোলিক অ্যাসিড, প্রায় ২০% ওলিক অ্যাসিড এবং প্রায় ১১% স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে - স্টিয়ারিক অ্যাসিড ৬% এবং পামিটিক অ্যাসিড ৫% থাকে।

পশ্চিম আফ্রিকার পাম তেল

সরিষার তেলের ঝাঁজ যখন বাঙালীর ঘরে ঘরে বিশেষ জায়গা দখল করে আছে ঠিক সেই সময় ফিস ফিস করে কেউ যেন বলেও গেল পাম তেলটাও কিন্তু খারাপ নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের পাম তেল ব্যবহারের ইতিহাস জানার জন্য ফিরে যেতে হবে ৫০০০ বছর পিছনে পশ্চিম আফ্রিকায়। ১৮০০-এর দশকের শেষের দিকে, প্রত্নতাত্ত্বিকরা মিশরের অ্যাবাইডোস (Abydos) এ ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পুরনো একটি সমাধিতে একটি পদার্থ আবিষ্কার করেন এবং তারা উপসংহারে পৌঁছান যে এটি মূলত পাম তেল ছিল। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, আরব ব্যবসায়ীরা পাম তেল মিশরে নিয়ে আসেন। আফ্রিকান পাম তেল এর গাছ (*Elaeis guineensis*) থেকে পাম তেল পশ্চিম এবং মধ্য আফ্রিকার

দেশগুলোতে স্বীকৃত হয়েছে এবং এটি ব্যাপকভাবে রান্নার তেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সেখান থেকেই ইউরোপীয় বণিকরা মাঝে মাঝে পশ্চিম আফ্রিকার ব্যবসায়ীদের সাথে পাম তেল ক্রয় করতো এবং ইউরোপে নিয়ে যেত রান্নার তেল হিসাবে ব্যবহারের জন্য। শিল্প বিপ্লবের সময়কালে যন্ত্রপাতির জন্য পিচ্ছিলকারক (লুব্রিকেন্ট) হিসাবে ব্যবহারের জন্য পাম তেল ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের দ্বারা পরবর্তীতে জনপ্রিয় পণ্য হয়ে ওঠে। দেশ বিদেশে বেশ কিছু সাবান প্রস্তুতকারী সংস্থাও পাম তেল ব্যবহার করত।

পাম তেল, পাম কার্নেল তেল এবং নারেকেল তেল—তথাকথিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় তেল—একটি খারাপ খ্যাতি পেয়েছে কারণ এসব তেলে থাকে প্রচুর পরিমাণে স্যাচুরেটেড ফ্যাট, যা দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগের কারণের জন্য দায়ী স্যাচুরেটেড ফ্যাট খারাপ এলডিএল কোলেস্টেরল এবং ট্রাইগ্লিসারাইড বাড়ায়, উভয়ই হৃদরোগের ঝুঁকির কারণ। ভোজ্য তেল হিসেবে এর সুখ্যাতি খুব বেশীদিন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বিটা-ক্যারোটিনের পরিমাণ বেশি থাকায় পাম তেল প্রাকৃতিকভাবে লালচে হয়। অপরিশোধিত লাল পাম তেলকে পরিশোধন করার জন্য প্রশমিত, ব্লিচড এবং ডিওডোরাইজড করা হয়। পরিশোধিত, ব্লিচড এবং ডিওডোরাইজড (RBD) পাম তেলে ক্যারোটিনয়েড থাকে না। পাম তেলের অনেক শিল্প খাদ্য প্রয়োগে পাম তেলের ভগ্নাংশ উপাদান ব্যবহার করা হয়। যার স্যাচুরেশন মাত্রা ৯০% পর্যন্ত পৌছতে পারে।

সয়াবিন তেল

লিখিত আকারে নথি রাখবার প্রচলন অনেক প্রাচীন সভ্যতায় থাকলেও, প্রাচীন চিনের পরিকল্পনা ছিল একধাপ এগিয়ে। নথিকে দীর্ঘদিন রাখবার জন্য তারা কালিতে ব্যবহার করত সয়াবিন তেল। সয়াবিন তেল হল অনেকগুলি শুকানোর তেলের মধ্যে একটি, যার অর্থ হল এটি বাতাসের সংস্পর্শে আসার পরে ধীরে ধীরে (ফ্রি-র‍্যাডিক্যাল ভিত্তিক পলিমারাইজেশনের কারণে) শক্ত হয়ে যাবে, একটি নমনীয়, স্বচ্ছ এবং জলরোধী কঠিন গঠন করবে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে, এটি কিছু মুদ্রণ কালি এবং তেল রং ফর্মুলেশন ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য তেল যেমন তিসি তেলের মধ্যেও এরূপ কিছু গুণাবলি পাওয়া যায়। চিনা নথিতে খ্রিস্টোর ২০০০ বছর পূর্বেই সয়াবিন তেলে উল্লেখ পাওয়া গেছে।

বাঙালীর হেঁশেলেও সয়াবিন তেল বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। হৃদরোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা যখন ক্রমেই বেড়ে চলেছে তখন ভেবেচিন্তে নির্বাচন করছেন গিন্নিমা। ভালো কোলেস্টেরলের আশায় অনেকেই রান্নায় ব্যবহার করছেন সয়াবিন তেল। সয়াবিন তেলে ফ্যাটি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড সাধারণত এস্টার রূপে থাকে। সয়াবিন তেল ট্রাইগ্লিসারাইডের প্রধান অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড হল পলিআনস্যাচুরেটেট আলফা-লিনোলিক অ্যাসিড এবং লিনোলিক অ্যাসিড, এবং মনো-আনস্যাচুরেট ওলিক অ্যাসিড। এটিতে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড স্টিয়ারিক অ্যাসিড, এবং পামিটিক অ্যাসিড অল্প পরিমাণে বিদ্যমান। প্রাপ্ত সয়াবিন তেলের গুণগত মান বাড়াতে চলেছে বেশ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা। যেমন, অক্সিডেশন-প্রবণ পলি-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের উচ্চ-অনুপাত কিছুক্ষেত্রে অসুবিধায় ফেলে। তাই লিনোলেইক অ্যাসিডের অসম্পৃক্ততা কমাতে হাইড্রোজেন সংযোজন করা হয়। এরূপ তেলকে হাইড্রোজেনেটেড সয়াবিন তেল বলা হয়। হাইড্রোজেনেশন শুধুমাত্র আংশিকভাবে সম্পূর্ণ হলে, তেলে অল্প পরিমাণে ট্রান্স ফ্যাট থাকতে পারে।

পরিশোধনের নেপথ্যে

আজকাল একটি বয়স সীমার পরেই সকলে ভাবতে বসে নিজের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে। অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়া, ট্রাইগ্লিসারাইডের আক্রমণ, ডায়াবেটিসে ভোগা, হৃদ রোগের ঝুকি ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ভোজন রসিক মানুষও বাছতে শুরু করেছেন কোন তেলের রান্না খাবেন। বিজ্ঞাপনে চমক দিতে কেউ বলছেন ভালো কোলেস্টেরল ও বাজে কোলেস্টেরলের গল্প।একটা সময় চাহিদার পর্যাপ্ত যোগান পেতে মানুষ করা নেড়েছিল শিল্প কারখানায়। আজ সেটাই হয়ে গেছে তাদের কাছে মুনাফা লুটের আশীর্বাদ। হারিয়ে গেছে সনাতন পদ্ধতিগুলো। ঘরোয়া পদ্ধতিতে বীজ বা ফল থেকে তেল নিষ্কাশন আজ খুব একটা নজরে আসেনা। ঘানির তেল পরিশোধিত নয়, এই তকমায় অনেকে ভোজ্য তেলের তালিকায় রাখেনা। আরেকটি বড় বিষয় এই ভাবে প্রাপ্ত তেল অল্পদিনেই তার স্থায়িত্ব হারায়। এই সমস্ত কারণে প্যাকেটজাত তেলের দিকেই আমাদের নজর বেশী। আমরা আকৃষ্ট হয়ে পড়ছি বিজ্ঞাপনের চমকে। তুলে নিচ্ছি কোন না কোন ব্র্যান্ডের তেল।

কিন্তু পরিশোধনের সময় প্রয়োগ করা হয় উচ্চতাপ। তাতে অনেক ক্ষেত্রেই নষ্ট হয় প্রাকৃতিক উপাদানের গঠন (morphology)। তেলে মিশ্রিত মোম জাতীয় পদার্থ অপসারনের জন্য ও উচ্চ আনবিক গুরুত্ব সম্পন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রশমণ ক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হয়। এতে অনেকাংশেই তেল তার স্বাভাবিক গন্ধ এবং রঙ হারিয়ে ফেলে। নষ্ট হয়ে যায় তেলে থাকা জারক রোধী (Antioxident) এবং বর্ণ উৎপাদনকারী (রসায়নের ভাষায় ফ্লেভনয়েড) প্রাকৃতিক উপাদানগুলো। শুধু তাই নয় পরিশোধনে দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয় হেক্সেন নামক ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ। পরিশোধিত তেল থেকে তার সম্পূর্ণ অপসারন কতটা সম্ভব, প্রশ্ন জাগে মনে। তাছাড়া স্টিম পাতনে বেশ কিছু তেলে উপস্থিত উদ্বায়ী প্রাকৃতিক উপাদান উড়ে চলে যায়, সেই সঙ্গে নষ্ট হয় কিছুটা তার কার্যকারিতা। একদিকে পরিশোধনের নামে নষ্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক পুষ্টিগুণ অন্যদিকে যুক্ত হচ্ছে কিছু অতিরিক্ত ক্ষতিকারক পদার্থ। শরীরে বাড়ছে ট্রান্স ফ্যাটের পরিমাণ। যে কারণে শরীরে হাইকোলেস্টেরল ইন্সুলিন ও ট্রাইগ্লিসারাইডের পরিমাণ বাড়ছে।

স্বাস্থ্যসম্মত তেল পেতে ঘরোয়া উপায়ে পরিশোধনই শ্রেয়। সরকারী ভাবে তেল উৎপাদনকারী সংস্থাগুলোর উপর কিছু নিয়ম নীতি আরোপ করা যেতে পারে। শীতল অবস্থায় চাপ প্রয়োগে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত কিছু প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন, খনিজ যোগ করা যেতে পারে। তেলের মোড়ক ভালো করে দেখতে হবে। তাতে ব্লেন্ডেড তেল (blended oil) কথাটি লেখা থাকলে তা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকাই ভালো। কারণ এতে ট্রান্স ফ্যাটের পরিমাণ বেশী থাকে। বেশী সময় নিয়ে অল্প আঁচে রান্নাই শ্রেয় মনে করছেন অনেকে। রান্নায় পুরোপুরি তেল বর্জন কোনভাবেই সম্ভব নয়। তেলে হাইড্রোজেন যুক্ত করে মার্জারিন, বনস্পতি ঘী অথবা বিশুদ্ধ ঘী এর ব্যবহার কিছু ক্ষেত্রে মন্দ নয়। তাই অল্পে মানিয়ে নেওয়ার অভ্যাসও একটি বিকল্প পথ হতে পারে। অল্পে খুশি হয়ে, সচেতন ভাবে খাওয়ায় রাশ টানা একটি ইতিবাচক দিক সেকথা বলাই বাহুল্য। স্বাস্থ্যই সম্পদ, তাই আপনার স্বাস্থ্য অনেকাংশে আপনারই হাতে।

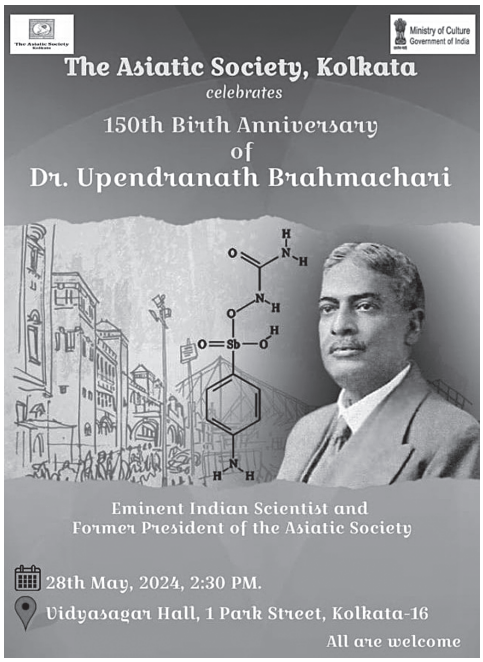
লেখক প্রধান শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: tdcob25@gmail.com • M. 8944996755

রা জ দী প ভ ট্টা চা র্য

ডা. উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

১৯৪০ সালের ২৭ আগস্ট, স্বনামধন্য মেঘনাদ সাহা চিঠি লিখছেন প্রাগৈতিহাসিক উদ্ভিদবিদ্ বীরবল সাহানীকে। সাহার বক্তব্য শ্রী ব্রহ্মচারী এফ.আর.এস. বারয়াল সোসাইটির সদস্য হওয়ার জন্য অতি যোগ্য এক মানুষ, এ বিষয়ে শ্রী সাহানীর প্রত্যক্ষ সমর্থন তিনি আশা করছেন। একইভাবে পদার্থবিদ কে.এস. কৃষ্ণন-এর সমর্থনও জোগাড় করলেন মেঘনাদ। ব্রিটিশ রসায়নবিদ জে.এল. সাইমনসেন এক্ষেত্রে প্রোপোজার হতে রাজি হলেন। কিন্তু লন্ডনের উদ্দেশ্যে পাঠানো কাগজপত্র মাঝপথে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ায় মেঘনাদের সকল উদ্যোগ বিফলে গেল। পুনরায় যাবতীয় কাগজপত্রের বন্দোবস্ত করে রয়াল সোসাইটির কাছে আবেদনপত্র জমা দেওয়া হয় ১৯৪১ সালের ২৩ জুন। যার প্রোপোজার সাইমনসেন এবং সমর্থক মেঘনাদ সাহা, বীরবল সাহানী, কে.এস. কৃষ্ণন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে ১৯৪৩ সালে রয়াল সোসাইটির সম্পাদক এ.ভি. হিল ভারতে এলে সাহা তাঁর সাথে দেখা করে পুনরায় অনুরোধ করেন। কিন্তু হিল শ্রী ব্রহ্মচারীর কাজকে তেমন গুরুত্ব দিতে না চাইলে মেঘনাদ সাহা বলেন যে, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ রক্ষা ছাড়াও ইউরিয়া স্টিবামাইনের আবিষ্কার একটি মহান বৈজ্ঞানিক কাজ। যা সম্ভব হয়েছে একজন মানুষের দীর্ঘ পরিশ্রম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে। শরীরতত্ত্ব, রসায়ন ও চিকিৎসাবিদ্যায় গভীর জ্ঞান এবং অসীম ধৈর্য ছাড়া যা সম্ভব হত না। (“My connection is that apart from the saving of millions of lives, the discovery of Urea Stibamine is a great piece of scientific work, brilliantly conceived and persued for years with a single-minded devotion admist great difficulties. Only one having masterly knowledge of sciences of physiology, chemistry and therapeutics and having infinite patience could have achieved it.”) মেঘনাদের সাথে কথোপকথনে হিল মি. ব্রহ্মচারীকে এফ.আর.এস.-এর উপযুক্ত বলে স্বীকার করলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে স্যার এল. রজার্স ব্যথার চিকিৎসাবিদ্যা জগতের অন্যতম মাথা। তিনি বিভিন্ন অন্যায় পদ্ধতিতে জটিলতা ও বাধার সৃষ্টি করলেন এবং বিষয়টির পরিণতি দীর্ঘায়িত করতে সমর্থ হলেন। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পরলোক গমন করলেন স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। অন্যথায় চিকিৎসাবিদ্যায় ভারতের প্রথম এফ.আর.এস. হওয়া যাঁর কাছে ছিল শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।



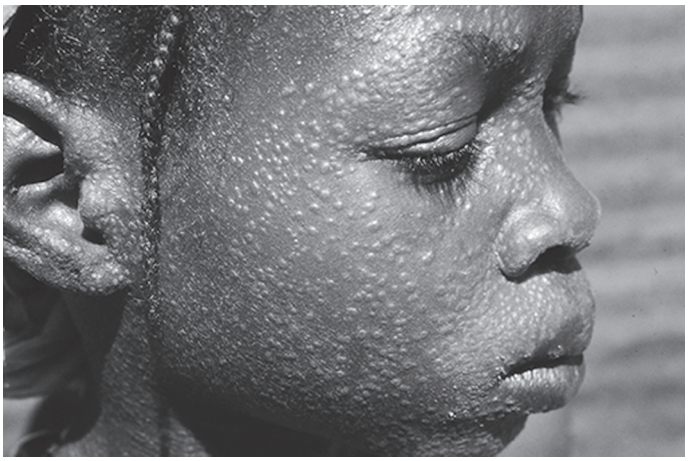
১৮৭৩ সালের ১৯ ডিসেম্বর শ্রী উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বিহারের মুঙ্গের জেলার জামালপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নীলমনি ব্রহ্মচারী ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়েজের একজন ডাক্তার। তাঁর মা-এর নাম সৌরভসুন্দরী দেবী। প্রথম জীবনে তিনি জামালপুরের ইস্টার্ন রেলওয়েজ বয়েজ হাইস্কুলে পড়াশুনা করেন। অতঃপর হুগলি মহসীন কলেজ থেকে অঙ্ক ও রসায়নে সাম্মানিক সহ বি.এ. পাশ করেন। রসায়ন নিয়ে ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখানে পেডলার, পি.সি. রয় প্রমুখ ছিলেন তাঁর শিক্ষক। উপেন্দ্রনাথের জীবনে প্রফুল্লচন্দ্রের গভীর প্রভাব ছিল। ১৮৯৪ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়নে প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। সাথে সাথে কলকাতা মেডিকেল কলেজে মেডিসিন বিভাগেও ভর্তি হয়েছিলেন উপেন্দ্রনাথ। ১৮৯৯ সালে সেখান থেকে এল.এম.এস. হন তিনি। পরের বছর অর্থাৎ ১৯০০ সালে মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগে প্রথম হয়ে এম.বি. ডিগ্রি লাভ করেন এবং সাথে সাথে তাঁকে ‘গুডইভ ও ম্যাকলিওড’ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ১৯০২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উপেন্দ্রনাথ এম.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। লোহিত রক্তকণিকা বিষয়ক তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণার জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. রূপে ভূষিত হন। ব্যক্তিগত জীবনে উপেন্দ্রনাথ ননীবালা দেবীর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

১৮৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উপেন্দ্রনাথ প্রভিন্সিয়াল মেডিকেল সার্ভিসে যোগ দিলেন। ১৯০১ সালে তিনি শরীরতত্ত্ব ও মেটেরিয়ামেডিকা-র শিক্ষক-চিকিৎসক রূপে যোগদান করলেন ঢাকা মেডিকেল স্কুলে। বছর চারেক থাকলেন ঢাকায়। ১৯০৫ সালে ডাক এল কলকাতার ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল (বর্তমানে এন.আর.এস. মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল) থেকে। ১৯২৩ সালে মেডিকেল কলেজ হসপিটালের অতিরিক্ত চিকিৎসক হলেন উপেন্দ্রনাথ। ১৯২৭ সালে সরকারি চিকিৎসকের কাজ থেকে অবসর নিয়ে যুক্ত হলেন কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে। কলকাতা ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ সায়েন্স-এর জৈবরসায়ন বিভাগের প্রধান রূপে দায়িত্ব সামলালেন কিছুকাল। রসায়ন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর প্রতিভা বিকশিত হল অভূতপূর্ব মহিমায়।

দীর্ঘ চিকিৎসা জীবনে বহুমুখী বিষয়ে গবেষণা করেছেন উপেন্দ্রনাথ। ঢাকায় থাকাকালীন ভারতবর্ষের উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুর কিছু পরিচিত


অ্যানোফিলিস মশা

রোগের বিষয়ে একাধিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন তিনি। ১৮৯৮ সালে স্যার রোনাল্ড রস আবিষ্কার করেন যে অ্যানোফিলিস জাতীয় মশা হল ম্যালেরিয়া রোগের বাহক। উপেন্দ্রনাথ এই প্রকার মশার বসবাসস্থল প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে তিনি নতুন এক প্রকার মশা আবিষ্কার করেছিলেন। তৎকালীন বিজ্ঞান সমাজ বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করলেও পরে তা মাইজোমিয়া ব্রহ্মচারী (Myzomyia brahmachari) নামে পরিচিত হয়। রক্ত সম্বন্ধীয় গবেষণায় উপেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। এই বিষয়ে তাঁর একাধিক গবেষণাপত্র প্রকাশ পায়। রক্ত পরীক্ষার একটি নয়াপদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেন।



উপেন্দ্রনাথের দক্ষতার চূড়ান্ত প্রকাশ হয় কালাজ্বরের (*Visceral leishmaniasis*) ওষুধ ইউরিয়া স্টিবামাইন আবিষ্কারে, যা *Leishmani donovani* নামক প্রোটোজোয়ার মাধ্যমে ছড়ায়। বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে পৃথিবীর মোট কালাজ্বর আক্রান্ত রোগীর অর্ধেক ছিল ভারতবর্ষে। দেখা যায় যে বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ষাট হাজার মানুষ প্রতিবছর এই রোগের শিকার হয়। আর উপেন্দ্রনাথের সময়ে ভারতবর্ষে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল ভয়াবহ। Leishman এবং Donovan ইতিপূর্বে কালাজ্বরের পরজীবীটিকে চিহ্নিত করলেও তার সঠিক প্রতিষেধক তখনও আবিষ্কার হয়নি। শুধু বোঝা গেছে যে গড়ে ২২° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি উষ্ণতা এই রোগের পরজীবীদের পক্ষে অনুকূল। এজন্যই উত্তর-পূর্ব ভারতের শীতল এলাকাগুলিতে এই রোগের প্রভাব সর্বাধিক। আসাম ও উত্তর বাংলা জুড়ে কালাজ্বরের প্রভাবে তখন গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে। ওষুধ বলতে এক্ষেত্রে অ্যান্টিমনির বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগ ব্যবহার করা ছাড়া ডাক্তারদের হাতে অন্য কোন উপায় নেই। দীর্ঘদিন ধরে অ্যান্টিমনির ব্যবহারে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় রোগীর লিভার, কিডনি এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মারা যাচ্ছে অনেক রোগী। এমন সময়ে ইউরিয়া ও স্টিবানিলিক অ্যাসিডের যথাযথ মিশ্রণে উপেন্দ্রনাথ সৃষ্টি করলেন কালাজ্বরের ওষুধ ইউরিয়া স্টিবামাইন। এই আবিষ্কার ও সফল পরীক্ষার কথা প্রকাশিত হল ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে। 'ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ মেডিকেল রিসার্চ' পত্রিকায়। জৈবযৌগ হওয়ায় এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া প্রায় নেই। কালাজ্বর অধ্যুষিত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এর ব্যবহার শুরু হল। ১৯২৪ সালে শিলং-এর পাস্তুর ইনস্টিটিউট-এর চিকিৎসক এইচ.ই. শর্ট লিখেছেন 'রাতারাতি নব্বই শতাংশ মৃত্যুহার পরিবর্তিত হল নব্বই শতাংশ সুস্থ হওয়ার হারে'। পরবর্তীকালে ফ্রান্স, চিন, গ্রিস, সুদান প্রভৃতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সফলভাবে এই ওষুধের ব্যবহার হতে লাগল। উল্লেখ্য বিশেষ একপ্রকার ভারতীয় কালাজ্বরের আবিষ্কর্তাও ছিলেন এই উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

১৯২৪ সাল নাগাদ উপেন্দ্রনাথ তাঁর বাড়িতে স্থাপন করলেন 'ব্রহ্মচারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট'। পরবর্তীকালে যার অংশীদার হলেন তাঁর দুই ছেলে ফণীন্দ্রনাথ ও নির্মলকুমার। গবেষণা ও ওষুধ তৈরি চলতে লাগল এই সংস্থায়। কালাজ্বরের ওষুধের বিপুল চাহিদা দ্রুত ধনী করে তুলল উপেন্দ্রনাথকে। তবে ইউরিয়া স্টিবামাইনের কোন পেটেন্ট তিনি নিলেন না। ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই ওষুধ তৈরি করতে লাগল বিভিন্ন সংস্থা। ওষুধের গুণমান সর্বত্র সমান রইল না। কলকাতায় উপেন্দ্রনাথের সমালোচকদের বিশেষ সুবিধা হল এতে। ইংল্যান্ডের 'নেচার' পত্রিকায়এই বিষয়ে স্যার এল. রজার্স-এর লেখায় উপেন্দ্রনাথের আবিষ্কার সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করল, যা পরবর্তীকালে এফ.আর.এস. হওয়ার পথে হাজির করল হাজার জটিলতা।



ক্যাম্পবেল হাসপাতালে উপেন্দ্রনাথের স্মৃতিধন্য ঘর

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী রক্তদান বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৩৯ সালে কলকাতায় গড়ে উঠল বিশ্বের দ্বিতীয় রক্ত সংরক্ষণাগার (Blood bank)। তিনি হলেন বাংলার ব্লাড ট্রান্সফিউসন সার্ভিস-এর চেয়ারম্যান। উপেন্দ্রনাথ ছিলেন সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সহসভাপতি। প্রথম ভারতীয় হিসাবে রেড ক্রস সোসাইটির বাংলা শাখার চেয়ারম্যান হলেন তিনি। বিভিন্ন সময়ে সামাজিক কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন উপেন্দ্রনাথ। বর্ধমান জেলায় পূর্বস্থলীর সারডাঙা গ্রামে ছিল তাঁর দেশের বাড়ি। তাঁর অর্থসাহায্যে সেখানে গড়ে উঠল উচ্চবিদ্যালয়—পূর্বস্থলী নীলমণি ব্রহ্মচারী ইনস্টিটিউশন।

নিজের জীবনে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এই মানুষটি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছে গ্রিফিথ মেমোরিয়াল পুরস্কার। ১৯২১ সালে ক্যালকাটা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিন থেকে পেয়েছেন মিন্টো মেডেল। এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল তুলে দিয়েছে স্যার উইলিয়াম জোনস্ মেডেল। ভূষিত হয়েছেন

'রায়বাহাদুর' উপাধিতে। ১৯২৪ সালে গভর্ণর জেনারেল লর্ড লিটনের কাছ থেকে পেয়েছেন কাইজার-ই-হিন্দ স্বর্ণপদক। ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ সরকার উপেন্দ্রনাথকে ভূষিত করেছে 'নাইট' উপাধিতে। ১৯২৯ ও ১৯৪২ সালে উপেন্দ্রনাথ মেডিসিন ও শরীরতত্ত্ব বিষয়ে নোবেল পুরস্কারের জন্য প্রাথমিক ভাবে বিবেচিত হন।

১৯৩৬ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস ইন্দোরে অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। ১৯৩৬ সালে তিনি ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি, কলকাতার সভাপতি হন। লন্ডনের রয়াল সোসাইটি অফ মেডিসিন এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সেস তাঁকে সদস্যপদে অভিষিক্ত করে। ১৯২৮-২৯ সালে তিনি ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল-এর সভাপতি। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এই মহান মানুষটিকে সম্মান জানিয়ে পূর্বের লাউডন স্ট্রিট-এর নাম পরিবর্তন করে ড. উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী স্ট্রিট নামকরণ করে।

১৯৪৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় এই মহান মানুষটির মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর এতগুলো বছর পরে এই মহান মানুষটির কথা বলতে গিয়ে শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হয়ে আসে। ছাত্রজীবনে যেমন আমরা অসাধারণ মেধাবী উপেন্দ্রনাথকে দেখতে পাই, তেমনি কর্মজীবনে তাঁর কর্মশক্তি আমাদের অনুপ্রাণিত করে। ক্ষুদ্র অপরিসর ল্যাবরেটরিতে দিনের



ইউ.এন. ব্রহ্মচারী রোড

পর দিন পরীক্ষার পর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে লক্ষ্যের চূড়ায় পৌঁছানোর যে অদম্য প্রচেষ্টা, অসম্ভব ধৈর্য, অসাধারণ মেধা আমরা প্রত্যক্ষ করি তা তুলনাহীন। কালাজ্বরের প্রকোপে মানুষের মৃত্যুমিছিল স্তব্ধ করার জন্য যে চাবিকাঠি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন তা তাঁকে এনে দিয়েছিল এই দরিদ্র ভারতবর্ষের অসহায় মানুষের দুহাত ভরা আশীর্বাদ। তাইতো তাঁর মৃত্যুর পরে নেচার পত্রিকায় কালাজ্বরের ক্ষেত্রে দক্ষ গবেষক L.E. Napier লেখেন "With the death on February 6, [1946] of Sir Upendranath Brahmachari, India lost one of her most distinguished medical scientists. Sir Upendranath was best known to the world in general as the discoverer and introducer as a therapeutic agent, of one of the most successful anti-leishmanial drugs, urea stibamine; but those interested in medical research work in India knew him as an original and tireless investigator with a wide field of interest."

সময়রেখা

- ১৮৭৩ সালের ১৯ ডিসেম্বর বিহারের জামালপুরে উপেন্দ্রনাথের জন্ম।
- ১৮৯৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়নে স্নাতকোত্তর পাশ করে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি।
- ১৮৯৯ কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এল.এম.এস.।
- ১৯০০ কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.।
- ১৯০১ শিক্ষক-চিকিৎসক রূপে ঢাকা মেডিকেল স্কুলে যোগদান।
- ১৯০৫ কলকাতা ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে (বর্তমান এন.আর.এস. মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল) প্রত্যাবর্তন।
- ১৯২২ ইন্ডিয়ান জার্নাল অব মেডিকেল রিসার্চ পত্রিকায় ইউ.এন. ব্রহ্মচারীর কালাজ্বরের সফল ওষুধ ইউরিয়া স্টিবামাইন আবিষ্কারের সংবাদ প্রকাশ।
- ১৯২৩ কলকাতা মেডিকেল কলেজের অতিরিক্ত চিকিৎসক রূপে যোগদান।
- ১৯২৪ 'ব্রহ্মচারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট' স্থাপন।
- ১৯৩৪ 'নাইট' উপাধি লাভ।
- ১৯৪৬, ৬ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন।

লেখক শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: rajdib1976@gmail.com • M. 9836569850

সংবাদ

ডা. উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীকে স্মরণ

চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও কালাজ্বরের অব্যর্থ ওষুধ ইউরিয়া স্টিবামাইন আবিষ্কর্তা ডা. উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর সার্ধজন্মশতবর্ষ পালিত হল ২৮ মে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সভায় বক্তব্য রাখেন ডা. শঙ্করকুমার নাথ। ডা. নাথ ডা. ব্রহ্মচারীর বেশ কিছু দিক উল্লেখ করেন। বিজ্ঞানী শ্যামল রায় ও চন্দ্রিমা রায় কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কারের ইতিহাস ও ওষুধ ব্যবহার করে, কালাজ্বর



নিয়ন্ত্রণে ডা. ব্রহ্মচারীর কৃতিত্ব তুলে ধরেন। অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তী এই বিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার ও রয়েল সোসাইটির সদস্যপদ না দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এছাড়াও এদিনের সভায় বক্তব্য রাখেন ডা. সব্যসাচী চক্রবর্তী, অধ্যাপক বাসুদেব বর্মন, ডা. ব্রহ্মচারীর পৌত্রী ড. কণা চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক অরুনাভ মিশ্র, অধ্যাপক সিদ্ধার্থ জোয়ারদার ও ড. শতাব্দী দাশ প্রমুখরা।

প্রচ্ছদ কথা ৩

সন্দীপন তালুকদার[১] রাজর্ষি ঘোষ[২]

ভাইরাস

বিশ্বাস, বিসম্বাদ, বিজ্ঞান

২য় পর্যায়

ক) যদি বন্ধু হও...

বন্ধু ভাইরাস

বিজ্ঞানীদের কাছে পরিষ্কার হতে শুরু করে এই বিশেষ প্রকারের সংক্রামক বস্তু পোষক কোষের মধ্যে প্রবেশ করে অন্যান্য রোগ-সংক্রামক অণুজীবের মতই কাজ করে এবং পোষক-শরীরে নানা রকম রোগ লক্ষণ সৃষ্টি করে। তাই স্বভাবতঃই তারা ক্ষতিকর, অন্ততঃ সাধারণ মানুষের কাছে তারা অত্যন্ত ভীতিপ্রদ বস্তু বলে বিবেচিত হতে শুরু করে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই বিশেষ সংক্রামক বস্তুর আরো কিছু বৈশিষ্ট বিজ্ঞানীদের নজরে আসে। আমাদের দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে গঙ্গা অতি পবিত্র নদী। গঙ্গাজল এ দেশে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বা পূজা অর্চনার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে বিবেচিত হয়। শুধু তাই নয়, এ দেশের হিন্দুরা বিশ্বাস করেন গঙ্গার জল অন্যান্য নদীর জলের তুলনায় অনেক বেশী শুদ্ধ। এই বিশ্বাসের বৈজ্ঞানিক সত্যতা বিচার করতে উদ্যোগী হন এক বিশিষ্ট ইংরেজ অণুজীববিজ্ঞানী আরনেষ্ট হ্যানবারি হ্যানকিন (Ernest Hanbury Hankin)। কলেরা রোগ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেন, গঙ্গা নদীর তীরবর্তী জনপদে, যেখানে মানুষ গঙ্গার জলকে পানীয় এবং দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করে, কলেরা রোগের প্রকোপ সেখানে তুলনামূলক কম। তাঁর ধারণা হয়, গঙ্গা এবং যমুনা নদীর জলে এমন কোনো অজানা বস্তু থাকে যা কলেরা রোগের জন্য দায়ী সংক্রামক ব্যাক্টেরিয়া *Vibrio cholerae* কে ধ্বংস করতে পারে। হ্যানকিন এও খেয়াল করেন যে গঙ্গানদীর জলের এই অজানা বস্তু চেম্বারল্যান্ড ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে সহজেই অতিক্রম করে যায়। কিন্তু জলকে ফোটালে এই (অজানা) বস্তুর কার্যকারিতা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। হ্যানকিন ১৮৯৬ সালে ইউরোপের বিখ্যাত পাস্তুর ইনষ্টিটিউট থেকে তাঁর গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন যেখানে তিনি বলেন, 'It is seen that the unboiled water of the Ganges kills the cholera germs in less than 3 hours. The same water when boiled does not have the same effect. On the other hand– well water is a good medium for this microbe– whether boiled or filtered'। যদিও গঙ্গাজলের এই অজানা বস্তু যা ব্যাক্টেরিয়ার কার্যকারিতাকে বিনষ্ট করছে তার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচনে তিনি সক্ষম হননি। যদিও পরবর্তীকালে অনেক বিজ্ঞানীই এই পর্যবেক্ষণকেই 'ব্যাক্টিরিওফাজ' (Bateriophage) নামে বিশেষ এক ধরনের ভাইরাসের (যা কিনা ব্যাক্টেরিয়ার শরীরকে পোষক দেহ হিসেবে ব্যবহার করে এবং অনেক ক্ষেত্রেই অনেক কম সময়ের মধ্যে ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে ফেলে। প্রথম বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি বলে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে হ্যানকিনের এই গবেষণা বিজ্ঞানীদের মনে কিছুটা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করে যেখানে তিনি এই কলেরার জীবাণু নাশক পরিস্রাবণ যোগ্য বস্তুটিকে উদ্বায়ী (volatile) বলে বর্ণনা করেন। ব্যাক্টেরিয়ার শরীরে প্রবেশ করে বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম এই ব্যাক্টেরিয়া-নাশী বিশেষ প্রকারের ভাইরাস আবিষ্কারের কৃতিত্ব ইংরেজ অণুজীবিজ্ঞানী ফ্রেডেরিক টর্টের (Frederick Twort)। হ্যানকিনের গবেষণাপত্র প্রকাশের প্রায় কুড়ি বছর পর ১৯১৫ সালে তিনি স্ট্যাফাইলোকক্কাস (staphylococcus) নামক বিশেষ এক প্রকার সংক্রমণ সৃষ্টিকারী ব্যাক্টেরিয়া নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেন আগার সমৃদ্ধ কৃত্রিম পোষক মাধ্যমে যখন এই ধরনের ব্যাক্টেরিয়াকে কর্ষণ করা হয় তখন বিশেষ কিছু কলোনি (colony) (বহু সংখ্যক ব্যাক্টেরিয়া কোষের সমন্বয়ে গঠিত একই ধরনের ব্যাক্টেরিয়ার সংগঠন) কাঁচের মত স্বচ্ছ ও তরল সমৃদ্ধ হয়। তিনি এই তরল কলোনি সংগ্রহ করে চেম্বারল্যান্ড ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে চালনা করে তাকে পরিস্রুত করেন এবং লক্ষ্য করেন যে, এই পরিস্রুত তরলকে নতুন ব্যাক্টেরিয়া কলোনির সংস্পর্শে আনলে তা আবার আগের মতন স্বচ্ছ ও জোলো হয়ে যায়। টর্ট সিদ্ধান্ত করেন এই নতুন ধরনের সংক্রামক বস্তু যা ব্যাক্টেরিয়ার থেকেও আকারে ছোটো তা হয়তো 'an amoeba– a ultramicroscopic virus– a living protoplasm or an enzyme with the power of growth' এর প্রায় একই সময়ে আরেকজন ফ্রেঞ্চ-কানাডিয়ান অণুজীববিজ্ঞানী ফেলিক্স ডি হ্যারেল (Felix d'H'erelle) ব্যাক্টেরিয়াকে আগার প্লেটে কর্ষণ করতে গিয়ে লক্ষ্য করেন যে প্লেটের কিছু অংশের ব্যাক্টেরিয়া কোনো অদৃশ্য বস্তুর সংস্পর্শে এসে মরে যাচ্ছে। আগার প্লেটের সেই বিশেষ অংশ থেকে 'an invisible antagonist' কে পৃথক করে চেম্বারল্যান্ড ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে চালনা করে পরিস্রুত করেন। এই বিশেষ antagonist-এর অস্তিত্ব এই তরলে আছে বুঝতে পেরে তরলের ঘনত্বকে কমিয়ে (জল যোগ করে তাকে লঘু করে, ব্যাক্টেরিয়ার কালচার প্লেটে (আগার সমৃদ্ধ যে কাঁচের পাত্রে ব্যাক্টেরিয়াকে সংরক্ষণ করা হয়) প্রয়োগ করে লক্ষ্য করেন এই কম ঘনত্বে ঐ পরিস্রুত তরল সব ব্যাক্টেরিয়াকে ধ্বংস করার বদলে কিছু নির্দিষ্ট অংশের ব্যাক্টেরিয়াকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। কালচার প্লেটে এই মৃত ব্যাক্টেরিয়ার কলোনিগুলির সংখ্যা গণনা করে এবং যে হারে প্রাথমিক ভাইরাস সমৃদ্ধ পরিস্রুত তরলকে লঘু করা হয়েছে তা নির্ণয় করে (dilution factor) তিনি এই তরলে অজানা antagonist-এর সংখ্যা



E.H. Hankin



F. d'H'erelle

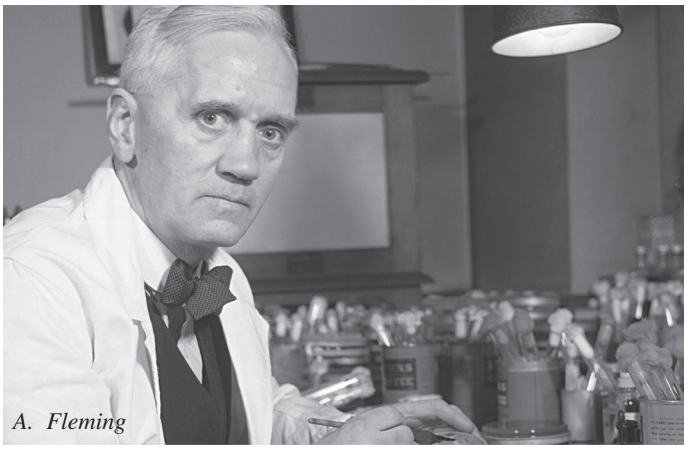
হিসেব করতে সক্ষম হন। তিনি বুঝতে পারেন এই বিশেষ ধরনের filterable agent যা ততদিনে বৈজ্ঞানিক মহলে ভাইরাস বলে স্বীকৃতি পেতে শুরু করেছে, তা পূর্বে বর্ণিত filterable agent-এর চেয়ে কিছুটা আলাদা। ডি হ্যারেল এই বিশেষ ধরনের filterable agent-এর, যা ব্যাক্টেরিয়ার দেহে প্রবেশ করে সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং তাকে হত্যা করে, নাম দেন 'ব্যাক্টিরিওফাজ' (Bateriophage) অর্থাৎ eater of bacteria বা 'ব্যাক্টেরিয়ার খাদক' (এই শব্দের উৎপত্তি হয়েছিল প্রাচীন গ্রীক শব্দ phagein থেকে যার অর্থ 'to eat' বা 'খাওয়া')। ভাইরাস সংক্রান্ত গবেষণায় এই আবিষ্কার একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ, কারণ এর আগে পর্যন্ত ভাইরাসকে কেবলমাত্র রোগ সংক্রামক বস্তু হিসেবে বৈজ্ঞানিকমহল জেনে এসেছে। পরবর্তী কয়েক বছরে ডি হ্যারেল আরো কয়েকধরনের ব্যাক্টিরিওফাজের অস্তিত্বের প্রমাণ পান যারা আরো অন্যান্য নানা ধরনের ব্যাক্টেরিয়ার দেহে প্রবেশ করে তাদের ধ্বংস করতে সক্ষম। *Vibrio cholerae* অর্থাৎ কলেরার রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাক্টেরিয়াকে ধ্বংস করতে পারে এমন ব্যাক্টিরিওফাজও তিনি খুঁজে বের করেন। ব্যাক্টেরিয়া ঘটিত সংক্রামক রোগের চিকিৎসায় এই আবিষ্কার এক নতুন দিগন্তের উন্মেষ করে। এই কলেরার সংক্রমণ সৃষ্টিকারী ব্যাক্টেরিয়াকে প্রতিহত করতে পারে এমন বিশেষ ধরনের ব্যাক্টিরিওফাজের সাহায্যে কলেরাকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্য নিয়েই ডি হ্যারেল ১৯২৭ সালে কলকাতায় আসেন। এর আগের বছরই মুম্বাইয়ের ঐতিহ্যশালী গবেষণা-প্রতিষ্ঠান Haffkine Institute-এ ডি হ্যারেল প্লেগ প্রতিরোধী ব্যাক্টিরিওফাজের স্ট্রেন নিয়ে গবেষণা করতে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা এবং কর্মদক্ষতায় ঐ প্রতিষ্ঠানের সহকারী অধিকর্তা মেজর রেজিন্যাল্ড ম্যালোন (Major Reginald Malone) অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং পূর্বভারতের কলেরা কবলিত অঞ্চলে এই ব্যাক্টিরিওফাজের প্রয়োগ করতে ডি হ্যারেলকে অনুরোধ জানান। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কলেরা নিয়ে গবেষণা করতে ডি হ্যারেলকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন তৎকালীন ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের (বর্তমানে নীলরতন সরকার মেডিকেন কলেজ ও হাসপাতাল) চিকিৎসক ডাঃ এম এন লাহিড়ী। প্রতিভাশালী এই চিকিৎসক ও অণুজীববিজ্ঞানী ডাঃ লাহিড়ী কেবলমাত্র ভারতীয় হওয়ার "অপরাধে" Indian Medical Service-এ নির্বাচিত হন নি। পরবর্তীকালে তৎকালীন সময়ের প্রধান চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা সমিতি Indian Research Fund Association-এর Bacteriophase enquiry শাখায় কলেরা এবং প্লেগের মত সংক্রামক রোগ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। ডি হ্যারেল, ম্যালোন এবং লাহিড়ীর সাহায্য এবং সহযোগিতায় তীর্থযাত্রীদের জন্য নির্ধারিত পানীয় জলের কুয়োয় (ইঁদারা) কলেরা প্রতিরোধী ব্যাক্টেরিওফাজের প্রয়োগ করে কলেরার সংক্রমণ কিছুটা হলেও প্রতিহত করতে সক্ষম হন। শুধু তাই নয়, প্রায় একই সময়ে ১৯২৯ সালে ক্যাম্পবেল হাসপাতালের কলেরা সংক্রান্ত গবেষকদলের দুই সদস্য সরঞ্জাম খান (Saranjam Khan) এবং এম এন লাহিড়ী সে সময়ের রাশিয়ার আরেক বিখ্যাত অণুজীববিজ্ঞানী ইগর নিকলাস য়্যাশেসভের (Igor Nicholas Asheshov) সাথে যৌথভাবে ব্যাক্টেরিওফাজ প্রয়োগ করে ভারতবর্ষে কলেরা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁদের কর্মক্ষেত্র ছিল বিহারের পাটনা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। তাঁরা বিভিন্ন হাসপাতাল এবং জনবহুল অঞ্চলে কলেরা রোগীদের চিকিৎসা করার পাশাপাশি কলেরার জীবাণুর সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করতেও উদ্যোগী হন। ১৯৩১ সালে তাঁরা Indian medical Gazette পত্রিকায় 'The treatment of cholera with bacteriophase' শিরোনামে তাঁদের গবেষণা পদ্ধতি এবং ফলাফলের বিস্তারিত বর্ণনা দেন।



কলেরার জীবাণু

অন্যদিকে ডি হ্যারেল কলেরার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের গবেষণায় প্রাথমিক সাফল্য পাওয়ার পর তাঁর গবেষণালবদ্ধ জ্ঞানের বাস্তব পটভূমিতে পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করতে এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেন। স্থানীয় গবেষক এবং চিকিৎসাকর্মীদের সহায়তায় তিনি কলেরার জীবাণু প্রতিরোধী ব্যাক্টেরিওফাজের স্ট্রেন/নমুনা বাংলা ও আসামের গ্রাম প্রধানদের মধ্যে বিলি করেন যাতে তারা গবেষকদের নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাঁদের গ্রামে গিয়ে পানীয় জলের উৎসে (পুকুর, ইঁদারা, ইত্যাদি) ঐ ব্যাক্টেরিওফাজ প্রয়োগ করে কলেরা প্রতিরোধ করতে পারেন। গবেষকদের আশা ছিল, এই ব্যাক্টেরিওফাজের নমুনার দীর্ঘমেয়াদী সফল প্রয়োগ ভারতবর্ষে কলেরা রোগ নিরাময়ে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। তৎকালীন সময়ের নিরিখে ডি হ্যারেল এবং তাঁর সহযোগীদের অভাবনীয় জনদরদি গবেষণা পদ্ধতি বিশেষ সাফল্য পেতে শুরু করে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে তখন কালো মেঘের ঘনঘটা। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ডাকে সত্যাগ্রহ এবং অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ তখন উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতবর্ষের গ্রামগুলিতে আঁছড়ে পড়েছিল। ডি হ্যারেল এবং তাঁর সঙ্গীদের গবেষণার ক্ষেত্রেও স্থানীয় মানুষের অসহযোগিতা এক প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আর এরই প্রভাবে ১৯৩৭ সালে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক এবং জনদরদি এই গবেষণা অচিরেই বন্ধ হয়ে যায়।

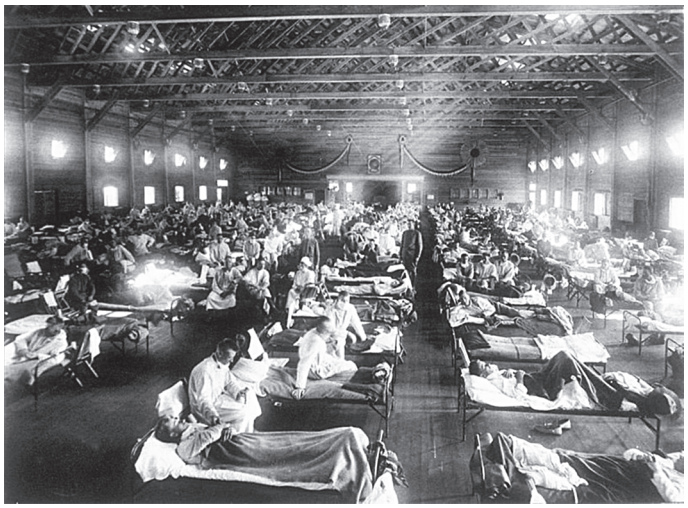
সে সময় রীতিমত ত্রাস সৃষ্টিকারী কিছু ব্যাক্টেরিয়া ঘটিত রোগের; যেমন টাইফয়েড, কলেরা প্রভৃতি চিকিৎসায় ব্যাক্টিরিওফাজের সফল প্রয়োগ শুরু হয়। কিন্তু তৎকালীন যুগের প্রচলিত ধারায় ভাইরাসের অস্তিত্ব সর্বজনস্বীকৃত না হওয়ায় ডি হ্যারেলকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। বিশিষ্ট নোবেল জয়ী বেলজিয়ান অণুজীববিজ্ঞানী জুলস্ বারডেট (Jules Bordet) হ্যারেলের ধারণার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ব্যাক্টিরিওফাজ আসলে ভাইরাস জাতীয় কোনো অলীক বস্তু নয়, বরং ব্যাক্টেরিয়া নিঃসৃত/ক্ষরিত কোনো ভাঙনমূলক উৎসেচক (Lysogenic enzyme)। তিনি এও বলেন 'The invisible world of dHerelle does not exist'. স্বভাবতঃই ব্যাক্টেরিয়া প্রতিরোধী বস্তু হিসেবে এই ব্যাক্টিরিওফাজের ব্যবহার ইউরোপ ও আমেরিকার চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের


A. Fleming

মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ না করলেও অবিভক্ত সোভিয়েত রাশিয়ায় (USSR) তা যথেষ্টই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। এরপর ১৯২৮ সালে স্কটল্যান্ডের স্বনামধন্য বিজ্ঞানী স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং যখন *Penicillium notetum* নামক ছত্রাক থেকে 'পেনিসিলিন' নামক অ্যান্টিবোটিক (antibiotic) আবিস্কার করেন তখন এর ব্যাক্টেরিয়া-প্রতিরোধী ক্ষমতায় চমৎকৃত হয়ে চিকিৎসকমহল ব্যাক্টেরিয়া ঘটিত রোগে ব্যাক্টিরিওফাজের ব্যবহার অনেকটাই কমিয়ে ফেলেন। এর পরবর্তী কয়েক দশকে অজস্র অ্যান্টিবোটিক আবিষ্কার হয়। কিন্তু বর্তমানে এই সকল অ্যান্টিবোটিকের বহুল ও অনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগে নির্দিষ্ট ব্যাক্টেরিয়ার মধ্যে যখন অ্যান্টিবোটিক-প্রতিরোধী ক্ষমতা গড়ে ওঠতে শুরু করেছে, তখন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা পুনরায় ব্যাক্টিরিওফাজের ব্যবহারের কথা পর্যালোচনা করেছেন।

খ) স্প্যানিশ ফ্লু
এক চূড়ান্ত বিভীষিকা

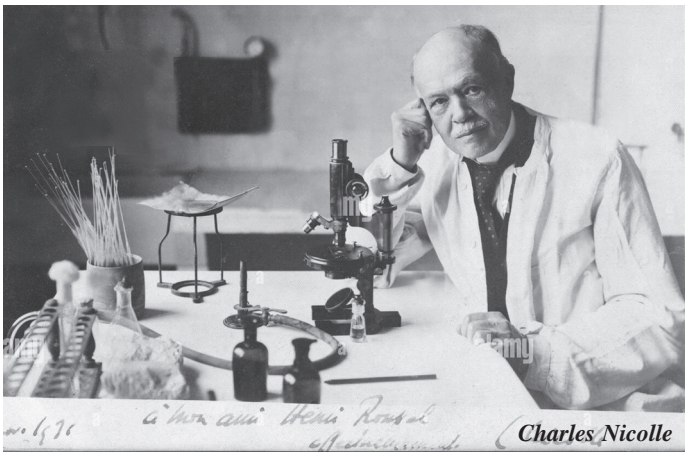
এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯১৮ সালে। সমগ্র ইউরোপ এবং আমেরিকার বাতাস তখন বারুদের গন্ধে ম ম করছে। যুদ্ধের রোষানলে যখন ইউরোপ-আমেরিকা অতিষ্ঠ তখন সে সব মহাদেশে দেখা দেয় আর এক বিভীষিকা - ইনফ্লুইয়েঞ্জা অতিমারী। বিজ্ঞানীরা একে বলেছেন 'mother of all pandemics'। ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার বষ্টন অঞ্চলের এক সামরিক ঘাঁটির সৈন্যদের মধ্যে প্রথম এর প্রভাব দেখা যায়। অতি দ্রুত তা ছড়িয়ে পরে আমেরিকার বিভিন্ন


স্প্যানিস ফ্লু : আমেরিকার এক সামরিক হাসপাতালের রোগীদের চিত্র

অঞ্চল সহ দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং এশিয়া মহাদেশের জাপানে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই অতিমারী পরিচিত হয়েছে স্প্যানিশ ফ্লু (Spanish flu) নামে যার পেছনে রয়েছে এক গূঢ় রাজনৈতিক কারণ। স্পেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি। তাই সে দেশের প্রচার মাধ্যমে এই অতিমারীর খবর প্রকাশিত হত কোনো সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই। অপরদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, জার্মানী কিংবা ফ্রান্সে এই অতিমারী ভয়ঙ্কর রূপ নিলেও দেশবাসীর মনোবল অটুট রাখতে সে সব দেশে অতিমারীর খবর ছাপা হত বেশ খানিকটা রেখে ঢেকে। ফলে সে সময় সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে মনে হয়েছিল একমাত্র স্পেনই বোধহয় এই রোগে সব থেকে বেশী আক্রান্ত। তাই সে সময় থেকেই এই রোগকে মানুষ জানতে শুরু করেছিল "স্প্যানিশ ফ্লু" নামে। মাত্র দেড় বছরের মধ্যে এই অতিমারীর করাল গ্রাসে বিশ্বে প্রাণ হারান প্রায় ৫ কোটি মানুষ। এই সংক্রমণ এতো দ্রুত ভয়ঙ্কর আকার নেয়ার জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধকেও হয়তো খানিকটা দায়ী করা যায়। সেনাছাউনির জনবহুল, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এই সংক্রমণ অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় রোগীদের মৃত্যুর পিছনে আসল কারণ নিউমোনিয়া যা হয় ফুসফুসে বিশেষ এক প্রকার ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণে। তৎকালীন চিকিৎসকরা, স্বভাবতঃই, এই অতিমারী মোকাবিলা করতে গিয়ে নিতান্ত অসহায় বোধ করেন। অ্যান্টিবোটিক, যা কিনা ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে, আবিষ্কৃত না হওয়ায় এই রোগে মৃত্যুহার অস্বাভাবিক রকমের বেশী হয়। বিজ্ঞানীরা এর নাম দেন "ইনফ্লুয়েঞ্জা" (ইতালীয় নাম, ইংরেজি প্রতিশব্দ influence)। সে সময় অনেক চেষ্টা করেও বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন নি ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত রোগীর ফুসফুসে কীভাবে ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ ঘটছে, যার ফলস্বরূপ রোগী ফুসফুসের কার্যহীনতা এবং শ্বাসকষ্টে মারা যাচ্ছেন। পরবর্তীকালে আমাদের ভাইরাস সংক্রান্ত জ্ঞানের পরিধি যত বেড়েছে আমরা বুঝতে পেরেছি ভাইরাসের রোগ সংক্রমণ পন্থাই এরকম। ভাইরাস শরীরে সংক্রমিত হওয়ায় শরীরের রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা এতো দুর্বল হয়ে পড়ে যে সে সময় বাতাসে ঘুরে বেড়ানো অসংখ্য অণুজীবের (ব্যাক্টেরিয়া বা ছত্রাক) দ্বারা আক্রান্ত হয়ে রোগলক্ষণের প্রকাশ ঘটাতে পারে। এ ক্ষেত্রে রোগ সংক্রমণের তীব্রতা এবং মৃত্যুভয় দুইই অনেক বেশী থাকে। পরবর্তীকালে ভাইরাস ঘটিত আর এক রোগলক্ষণ Acquired Immuno Deficiency Syndrome বা AIDS-এর ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানীরা একই রকম ঘটনা দেখতে পান। Human Immuno deficiency Virus (HIV)-এর, যার প্রভাবে এইডস্ (AIDS) হয়, তার সংক্রমণেও শরীরের রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা এতোটাই কমে যায় যে আক্রান্ত রোগী অতি সহজেই অন্যান্য অণুজীবের সংক্রমণের শিকার হয়।

যাইহোক, আবার আমরা ১৯১৮-র স্প্যানিশ ফ্লুয়ের কথায় ফিরে আসি। এর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বেশ সমস্যায় পড়েন। সে সময়ের অধিকাংশ সংক্রামক রোগের মতই প্রথমে মনে করা হয় এই রোগের কারণ কোনো ব্যাক্টেরিয়া। বিশিষ্ট জার্মান অণুজীববিজ্ঞানী রিচার্ড ফ্রেডেরিক জোহানেস পেফার (Richard Friedrich Johannes Pfeiffer) এই অতিমারী শুরু হওয়ার প্রায় ২৫ বছর আগে, ১৮৯২ সালে, ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের পেছনে ব্যাসিলাস (Bacillus) গোত্রীয় একপ্রকার ব্যাক্টেরিয়ার ভূমিকা বর্ণনা করেন। তিনি এর নাম দেন *Bacillus influenzae*

বা *Pfeiffer's bacterium* যা পরবর্তীকালে পরিচিত হয় *Haemophilus influenzae* নামে। যদিও সে সময় বেশ কিছু বিজ্ঞানী পেফারের এই দাবীর যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, কারণ শুধু ইনফ্লুয়েঞ্জা নয়, অ্যানথ্রাক্স, কলেরা এবং প্লেগের সংক্রমণের পেছনেও এই অণুজীবের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এরপর ১৯১৮ সালে স্প্যানিশ ফ্লু অতিমারীর সময় অনেক বিজ্ঞানীর ধরণা হয় যে এই মারাত্মক সংক্রমণের পেছনে রয়েছে পেফার আবিষ্কৃত এই ব্যাসিলাস জাতীয় ব্যাক্টেরিয়া। অতিমারী আক্রান্ত অনেক মানুষকে (সবাই নয়) পরীক্ষা করে দেখা গেল তাদের শরীরে এই ব্যাক্টেরিয়া উপস্থিত। কিন্তু এই ব্যাক্টেরিয়াকে পৃথক করে কর্ষণ (culture) করা সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞানীরা অতি তাড়াতাড়ি এই ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিষেধক টীকা প্রস্তুত করে প্রয়োগ করতে শুরু করেন। ফলস্বরূপ রোগাক্রান্ত মানুষের মধ্যে এই ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণের প্রভাব অনেকটাই কমতে শুরু করে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই অতিমারীর প্রভাবে হওয়া মৃত্যুহারের উপর এই প্রতিষেধক টীকা তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। স্বভাবতঃই এই টীকার যথাযথ কার্যকারিতার অভাব বিজ্ঞানীদের হতাশ করে। এদিকে অতিমারীতে আক্রান্ত হয়ে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা প্রতিদিন বেড়েই চলে। বিজ্ঞানীরা আবার নতুন করে এই ভয়ঙ্কর রোগের কারণ অনুসন্ধানে নামেন। সংক্রামক রোগের কারণ একটি ব্যাক্টেরিয়া - এই প্রচলিত ধারণার মূলে প্রথম কুঠারাঘাত করেন দুই ফরাসী গবেষক চার্লস নিকোলি (Charles Nicolle) এবং চার্লস লেবাইলি (Charles Labilly)। ১৯১৮ সালে প্যারিসের Academie des Science-এ পাঠানো এক গবেষণাপত্রে তাঁরা এই স্প্যানিশ ফ্লুয়ের সংক্রামক বস্তু সম্বন্ধে এক গভীর বিশ্লেষন ধর্মী পর্যালোচনা করেন। প্রথমে তিন দিন ধরে স্প্যানিশ ফ্লু আক্রান্ত রোগীর


Charles Nicolle

Bronchial expectoration (ফুসফুস ও শ্বাস নালীর শ্লেষ্মা মিশ্রিত থুথুর নমুনা) এর নমুনা তাঁরা সংগ্রহ করেন। প্রথমে এই নমুনা তাঁরা সরাসরি একাধিক প্রজাতির বাঁদরের শরীরে প্রবেশ করান অশ্রুথলি ও গলবিলীয় নাসিকা নালির মাধ্যমে। দেখা যায় ৫-৬ দিনের মধ্যে বাঁদরের শরীরে রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়। বিভিন্ন প্রজাতির বাঁদরের মধ্যে এই সংক্রামক বস্তুর সংক্রমণ তীব্রতাও বিভিন্ন রকম দেখা যায়। এবার তাঁরা আক্রান্ত বাঁদরের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে তাতে কোনো সংক্রামক বস্তুর অস্তিত্ব খুঁজে পান না। গবেষণার পরবর্তী ধাপে তাঁরা শ্লেমা মিশ্রিত থুথুর নমুনাকে পরীক্ষাগারে দীর্ঘ প্রক্রিয়াকরণ করে ব্যাক্টেরিয়া প্রতিরোধী ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে চালনা করে সেই filterable agentকে সুস্থ স্বেচ্ছাসেবী মানুষের শরীরে চামড়ার মাধ্যমে প্রবেশ করিয়ে (subcutaneous injection) দেখেন ৬ দিনের মাথায় তাদের শরীরে রোগলক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও দেখা যায় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবীর ক্ষেত্রে একই filterable agent-এর বিভিন্ন সংক্রমণ তীব্রতা দেখা যায়। যদিও শিরার মাধ্যমে (intravenous injection) এই নমুনা প্রবেশ করানো হলে কোনো স্বেচ্ছাসেবীর শরীরে কোনো রোগলক্ষণ প্রকাশ পায় না। এ থেকে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন, 'The infective agent of influenza is a filter passing organism– and the virus does not occur in the blood either in man or in monkeys— Pfeiffers bacillus it should be noted has occasionally been found in the blood' এর পরবর্তীতে একই পথে হাঁটেন নিউইয়র্কের বিখ্যাত গবেষণা-প্রতিষ্ঠান The Rockefeller Institute for Medical Research এর দুই বিজ্ঞানী পিটার ওলিটস্কি (Peter Olitsky) এবং ফ্রেডেরিক গেটস্ (Frederick Gates)। ১৯১৮ সালে তাঁরা স্প্যানিশ ফ্লু আক্রান্ত রোগীর নাসিকা পথে ক্ষরিত রসের নমুনা সংগ্রহ করে তাকে ব্যাক্টেরিয়া-প্রতিরোধী ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে চালনা করতে গিয়ে দেখেন যে এই রোগ সংক্রামক অণুজীব অন্যান্য ব্যাক্টেরিয়ার থেকে অনেক ছোট। তাঁদের পরীক্ষায় ব্যাক্টেরিয়া-প্রতিরোধী ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে চালনা করা এই পরিস্রাবক গবেষণাগারে সংক্রমণ সৃষ্টি করল খরগোশের ফুসফুসে। এই ঘটনা থেকে সংক্রামক বস্তুটি ব্যাক্টেরিয়ার বদলে কোনো নতুন প্রকৃতির পরিস্রাবণযোগ্য ভাইরাস হওয়ার সম্ভাবনা আরো উজ্জ্বল হয়। এই বিজ্ঞানীদ্বয় হয়তো ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসকেই চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তখনকার দিনের সব বিজ্ঞানীদের মতই তাঁরা এই সংক্রামক অণুজীবকে ব্যাক্টেরিয়া বলে বর্ণনা করেন এবং এর নাম দেন *Bacterium pneumosintes*। কিন্তু এ কথা সত্যি যে এই ১৯২০-র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই ইউরোপ এবং আমেরিকার বিজ্ঞানীরা filterable virus-এর অস্তিত্ব এবং রোগলক্ষণ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করেন। ১৯২৬ সালে আমেরিকার The Society of American Bacteriology এর সম্মেলনে আমেরিকান গবেষক থমাস মিল্টন রিভার্স (Thomas Milton Rivers) প্রথম ঘোষণা করেন, 'Viruses appear to be obligate parasites in the sense that their reproduction is dependent on living cell'। সে বছরই তিনি প্রায় ৬৫ রকমের রোগসংক্রামক বস্তুর এক তালিকা প্রস্তুত করেন যারা প্রত্যকেই filterable agent অর্থাৎ ব্যাক্টেরিয়ার থেকেও ক্ষুদ্রাকৃতি রোগ সংক্রামক বস্তু।

স্প্যানিশ ফ্লুয়ের সংক্রামক জীবাণুর পরিচয় অন্বেষণের গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য লাভ করে ১৯৩১ সালে আমেরিকান প্যাথলজিষ্ট আর্নেষ্ট উইলিয়াম গুডপাস্তুরের (Ernest William Goodpasture) হাত ধরে। তিনিই প্রথম ইনফ্লুয়েঞ্জা সহ বেশ কিছু ভাইরাসকে মুরগীর নিষিক্ত ডিমের ভিতর প্রতিপালন করতে সক্ষম হন। পৃথিবী আলোড়িত এই অতিমারীর প্রায় এক দশক পরে বিজ্ঞানীমহল নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে এই অতিমারী আসলে এক ভাইরাসের কুকীর্তির ফল। যদিও এই ভাইরাসের প্রকৃতি জানতে বিজ্ঞানীদের আরো প্রায় ছয় দশক লেগে যায়। এই দীর্ঘ সময় ধরে নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে বহু ব্যর্থতা ও হতাশার বাধা পেরিয়ে অবশেষে স্প্যানিশ ফ্লু অতিমারীতে মৃত রোগীদের 'permafrost' (মেরু অঞ্চলে বরফ আবৃত/মিশ্রিত মাটির স্তর)-এ সংরক্ষিত সমাধির মৃতদেহের ফুসফুসের নমুনা বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন এই ভাইরাস প্রকৃতপক্ষে H1N1 জাতীয় Influenza A virus যা সম্ভবতঃ পাখির শরীর থেকে মানুষের শরীরে সংক্রমণ সৃষ্টি করেছিল। ২০০৫ সালে influenza pandemic H1N1 ভাইরাসের সমগ্র

genome sequencing এর কাজ শেষ হয়। একাধারে এই আবিষ্কার যেমন শতাব্দী প্রাচীন মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক দুর্ভাগ্যজনক সংক্রমণের রহস্য উদ্ঘাটন করে তেমনি আধুনিক ভাইরাস বিশেষজ্ঞরা নতুন উদ্যমে এই ভাইরাসের প্রকৃতি, সংক্রমণ ঘটানোর পন্থা এবং পোষকের শরীরের উপর এর প্রভাব বিশ্লেষণের কাজে নিয়োজিত হন যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের সংক্রামক অতিমারীর সম্ভাবনা কমানো যায়।

ভাইরাস-বিজ্ঞান : আধুনিকতার মাত্রায় গঠন-বিশ্লেষণ ও নতুন গবেষণা

কিন্তু ১৯৩০-এর দশকের গোড়ায় পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল। ভাইরাসকে যতক্ষণ না দেখা যাচ্ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত এর অস্তিত্ব বিজ্ঞানী মহলে সর্বজনস্বীকৃত ছিল না। এই সুদীর্ঘকালীন সমস্যার এক যুগান্তকারী সমাধান পাওয়া যায় ১৯৩১ সালে যখন দুই জার্মান ইঞ্জিনিয়ার আর্নষ্ট রাস্কা (Ernst Ruska) এবং ম্যাক্স নল (Max Knoll) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। কোনো বস্তুকে চোখে দেখার শর্ত হল বস্তুটির মাত্রা (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা) তার উপর পতিত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সমান বা তার চেয়ে বড় হতে হবে। ভাইরাসের মাত্রা এতোই ছোট যে তাকে সাধারণ দৃশ্যমান আলোয় দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। সে কারণে যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তাকে দেখা যায় না। কিন্তু দৃশ্যমান আলোর বদলে ইলেক্ট্রনের স্রোতের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ভাইরাসের মাত্রার সাথে মিলে যায়। তাই দৃশ্যমান আলো নয়, ভাইরাসকে দেখতে হলে তার উপর ফেলতে হবে ইলেক্ট্রন কণার স্রোত। এ কারণেই ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ভাইরাস দৃশ্যমান। বেইজেরিংক ভাইরাসকে "তরল সংক্রামক বস্তু" রূপে বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিস্কারের পর জানা গেল ভাইরাস আসলে কণা বা Particle-এর মতন। কিছু বিশেষ ধরনের ভাইরাস, যেমন ব্যাক্টিরিওফাজের গঠনশৈলী বেশ জটিল, তাদের আকারও নানা রকমের। কোনো কোনোটির আকার ক্ষুদ্রতম ব্যাক্টেরিয়ার তুলনায় কিছুটা ছোট, আবার ক্ষুদ্রতম ভাইরাসের আকৃতি জটিল জৈব অণুর (Biomolecule) তুলনায় কিছুটা বড়। স্বভাবতঃই বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত টোবাকো মোজাইক ভাইরাসের গঠন নিয়ে আগ্রহী হন। ১৯৩৫ সালে ওয়েন্ডেল স্ট্যানলে (Wendell Stanley) বর্ণনা করেন, টোবাকো মোজাইক ভাইরাস কোনো সংক্রামক তরল নয়, বরং প্রোটিন দিয়েই এই ভাইরাসের দেহ তৈরী। ১৯৩৬ সালে তাদের এই গবেষণা বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক পত্রিকা Science-এ প্রকাশিত হতেই প্রায় ছয় দশক আগে শুরু হওয়া তামাক গাছের এক অজানা রোগ সংক্রমণের রহস্যভেদী গবেষণার পথে বিশেষ সাফল্য লাভ সম্ভব হয়। এর কয়েক বছর পর ১৯৩৯ সালে স্ট্যানলের সুযোগ্য ছাত্র হুর্বাট এস লোরিং SH. S. Loring প্রমাণ করেন টোবাকো মোজাইক ভাইরাস প্রকৃতপক্ষে প্রটিনের সাথে রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড (Ribo nucleic Acid বা RNA) নামক প্রোটিনের সঙ্গে এক প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত। এরপর ১৯৪১ সালে বিজ্ঞানী John Desmond Bernal এবং I. Frankuchen প্রথম টোবাকো মোজাইক ভাইরাসকে কেলাসিকৃত (crystallized) করে এক্স-রে (X-ray) বিচ্ছুরণের মধ্যমে এর নিবিড়তড়ো গঠন বিশ্লেষণের কাজ শুরু করেন। আসলে ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে ভাইরাসের বাইরের তলের গঠন (morphology) জানা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এর আণবিক গঠন-রহস্য উন্মোচনের জন্য প্রয়োজন ছিল সেকালে সদ্য আবিষ্কৃত এক্স-রে বিচ্ছুরণের পরীক্ষা। এই এক্স-রে বিচ্ছুরণের জন্য অণুর কেলাস প্রস্তুতি একান্ত প্রয়োজন, প্রোটিন বা রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিডের মতন জৈব অণুর জন্য যা মোটেও সহজ কাজ নয়। যাইহোক, এই Bernal এবং Frankuchen-এর গবেষণার উপর ভিত্তি করেই বিশিষ্ট কেলাসতত্ত্ববিদ্ (Crystallographer) এবং Deoxyribonucleic Acid (DNA)-এর দ্বিতন্ত্রী গঠনক্রম আবিষ্কারের অন্যতম পথিকৃৎ রোজালিন্ড ফ্রাঙ্কলিন (Rosalind Franklin) এই টোবাকো মোজাইক ভাইরাসের গঠনকে আরো নিবিড়ভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম হন। যদিও এর বছর দুয়েক আগে বিশিষ্ট আমেরিকান অণুজীববিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত জেমস ওয়াটসন (James Watson) টোবাকো মোজাইক ভাইরাসের এক্স-রে গঠন থেকে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে এর গঠন সম্ভবতঃ সর্পিলাকার বা Helical। শুধু এর প্রকৃত আকৃতিই যে বিজ্ঞানীদের কাছে আকর্ষণের বিষয়বস্তু ছিল তা নয়, এই বিশেষ ধরনের ভাইরাস কীভাবে তামাক গাছে সংক্রমণ সৃষ্টি করে তাও জানার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল। অবশেষে ১৯৫৬ সালে জার্মান জীবরসায়নবিদ্ হেনিজ ফ্র্যাঙ্কেল কর্ণাট (Heinz Fraenkel Cornat) এবং তাঁর সহযোগী গবেষণা প্রমাণ করে টোবাকো মোজাইক ভাইরাসের RNA-এই সংক্রমণের জন্য দায়ী। এর সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভিদের রোগ সংক্রমণবিদ্যা এবং অণুজীববিজ্ঞানের ইতিহাসে এক দীর্ঘদিনের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়।



কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে গবেষকত্রয়ীর হাত ধরে তামাক পাতায় অজানা রোগ সংক্রমণের গবেষণা শুরু হয় সেই বিজ্ঞানীত্রয় মায়ার, ইভানোভ্স্কি এবং বেইজেরিংক তিনজনের কেউই আর তখন বেঁচে নেই। আর টোবাকো মোজাইক ভাইরাসের প্রবল দাপটে নেদারল্যান্ড বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তামাক চাষ প্রায় বন্ধ হতে বসেছে। তবে এ কথা সত্য যে এই টোবাকো মোজাইক ভাইরাসকে জানার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এক নতুন ধরনের সংক্রামক বস্তুর পরিচয় পায় যার সংক্রমণ পদ্ধতি ছিল সেকালে আবিষ্কৃত নানা অণুজীব যেমন ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক অথবা প্রোটোজোয়ার থেকে অনেকটাই আলাদা। পরবর্তী সময়ে এই ভাইরাস নিয়ে নিত্যনতুন গবেষণা জীবের রোগ সংক্রমণ বা তার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে একের পর এক রূদ্ধদ্বার উন্মোচন করে চলেছে। কিন্তু আরো অনেক রহস্য আজও মানুষের অজানা। সারা পৃথিবীর নানান সম্ভাবনাময় গবেষকদল গবেষণা করে চলেছেন কীভাবে এই ভাইরাসের নাড়ী নক্ষত্র জানতে পারা যায়। শুধু বৈজ্ঞানিক মহলেই নয়, সাধারণ নিবার্চিত জনমানসেও ভাইরাস সম্পর্কে জ্ঞান ও সচেতনতা যত বাড়বে, ভাইরাস ঘটিত রোগ প্রতিরোধে সাফল্যের সম্ভাবনাও ততই উজ্জ্বলতর হবে।

তথ্যপঞ্জি

১. John M. Last. Edited 2007. Miasma Theory. A dictionary of public health. Westminster College–Pennsylvania– Oxford University Press.
২. Hoernle– A.F. Rudolf 1907. Studies in the medicine of ancient India. Gerstein University of Toronto. Oxford, At the Clarendon Press.
৩. A short history of the discovery of viruses– Ed Rybicki– Buglet Press–2015.
৪. The great influenza– J. M. Barry–Penguin books–London– 2004.
৫. History of Biology - Bacteiophases–H.W.Ackermann–Desk Encyclopedia of General virology–2009.

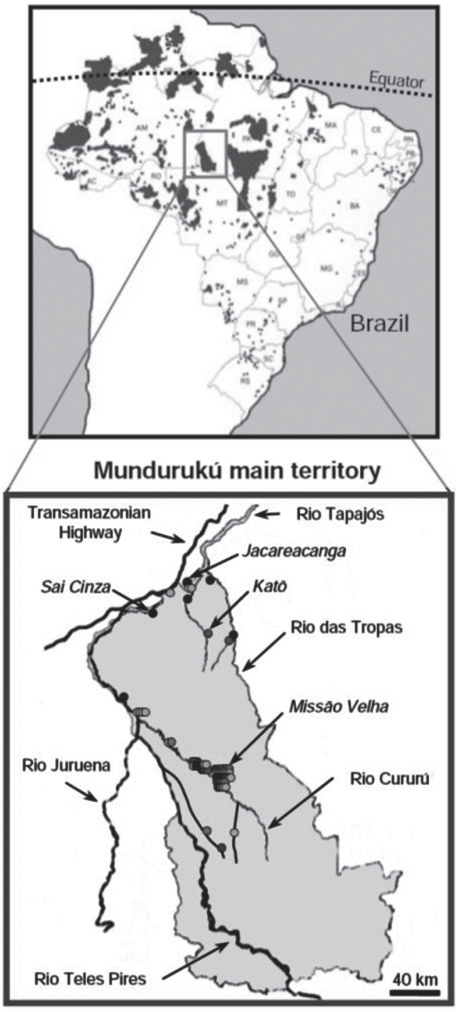
লেখক ১. প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, গোরুবাথান সরকারি কলেজ, কালিম্পং-৭৩৫২৩১, মো.-7076284998 ২. রসায়ন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান-৭১৩১০৪
email: rghosh@chem.bur.univ.ac.in • M. 8944830663

ড. অমিতাভ চক্রবর্তী

এক, দুই, তিন . . . অনেক

যদি প্রশ্ন করা হয় আমাদের হিসাবনিকাশের দক্ষতা কোথা থেকে এলো? পণ্ডিতরা হয়তো বলবেন মানুষের পুনরাবৃত্তিমূলক চরিত্রকে ভাষার অনুষঙ্গে প্রকাশ করার তাগিদেই মানবসভ্যতা সংখ্যার হিসাব করতে শিখেছিল। এই প্রসঙ্গে নোয়াম চমস্কি একবার বলেছিলেন- "সংখ্যা সম্পর্কে মানুষের ধারনাকে অবশ্যই আমরা নিজেদের ভাষার সাপেক্ষে বিমূর্ত কোনো কিছু বলে ধরে নিতে পারি, যা অসীম না হয়েও আমাদের পরিমাণের অনুভূতি প্রদান করে, অথচ শব্দ হিসাবে ভাষার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য থেকে তা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন"। বরং আরেকটু ভালোভাবে বিষয়টিকে বলা যাক। আমি যদি বলি 'তিন', তাহলে আদতে কিছুই বোঝানো হল না; কিন্তু তিনটি পাখি বা আমার দেখা পাখির সংখ্যা তিন বললে আমাদের মস্তিষ্কে উপাদানের পরিমাণ সম্পর্কে একটা অর্থবহ ধারণা হয়। সংখ্যা বোঝাতে চিহ্ন বা ভাষা দিয়ে এভাবেই আমরা দৈনন্দিন জীবনযাপনের স্বাভাবিকতা বজায় রাখি। আর আমাদের গণিত তথা হিসাবনিকাশের ভিত্তিই হল সংখ্যা।

তবে সংখ্যার ধারণা সঠিকভাবে প্রকাশ করতে ভাষার গুরুত্বও কম নয়। দেখা গেছে একটি শিশুর যখন সংখ্যার ধারণা গড়ে ওঠে নি, সেই সময় সে দুটো চকলেট আর তিনটি চকলেটের মধ্যে পার্থক্য করতে পারলেও সাতটি চকলেট ও দশটি চকলেটের মধ্যে নিঃসংশয়ে তফাৎ করতে পারে না। আচরণগত এবং নিউরোফিজিওলজিকাল বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষায় পাওয়া তথ্য অনুযায়ী সংখ্যার ধারণাহীন অবোধ শিশু ছাড়াও হাতি, গরিলা, ডলফিন, স্কুইরেল, মাঙ্কি ইত্যাদি কয়েক জাতের প্রাণী এক, দুই, তিন, এই প্রথম তিনটি সংখ্যার ধারণা পরিষ্কার করতে পারে, কিন্তু তিনের বেশি হয়ে গেলেই সংখ্যাগত ধারণা গুলিয়ে গিয়ে কোনো কিছুকে অনেক হিসাবে বিবেচনা করে বসে। দুটো খাঁচায় আলাদা করে দশটি ও কুড়িটি পাখি থাকলে ওদের মস্তিষ্ক বিষয়টিকে আলাদা করতে পারে না। অনেকে বলেন সংখ্যাগত ধারণার সঙ্গে ভাষার সংযোগ না থাকায় এইরকমটা হয়। যদিও ইদানিং বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ এই মতবাদ সমর্থন করেন না। কারণ হিসাবে তাঁরা কয়েকজন অটিজম আক্রান্ত রোগী পরীক্ষা করে দেখেছেন, যাদের ভাষাজনিত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক না থাকলেও মস্তিষ্কের গাণিতিক হিসাবনিকাশের প্রক্রিয়া অটুট রয়েছে।



ভূমিকা হিসাবে এই পর্যন্ত বলে আসল কথায় আসা যাক। ব্রাজিলের অ্যামাজন উপত্যকায় মুন্ডুরুকু (Mundurukú) নামে এক জনজাতির বাস। একটু ভুল হল, আসলে ওরা টুপাই Tupi গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত যাদের ভাষা মুন্ডুরুকু। ব্রাজিলের পারা (Para) প্রদেশে মোটামুটি হাজার সাতেক মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন। তবে মুন্ডুরুকু নামেই ওরা বেশি পরিচিত। সরকারি প্রতিষ্ঠান ও মিশনারিদের মধ্যস্থতায় আদিবাসী নয় এমন কিছু সংস্কৃতি ও ব্যক্তির সঙ্গে ইতিমধ্যেই ওদের যোগাযোগ ঘটে গেছে। ফলে আজকাল মুন্ডুরুকু শিশুরা অনেকেই বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত, এমনকি বড়োরা কেউ কেউ পর্তুগীজ ভাষায় কথাও বলতে পারেন। প্রায় দুদশক আগে পিয়ের পিকা নামে এক ফরাসী গবেষক ও ভাষাতত্ত্ববিদ মুন্ডুরুকুদের সঙ্গে কয়েকমাস কাটিয়েছিলেন। অ্যামাজন রেইনফরেস্টের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে কতগুলি ছোটো ছোটো গ্রামে এই জনজাতির মানুষেরা থাকেন। পিকা ছিলেন শ্রদ্ধেয় আমেরিকান দার্শনিক ও ভাষাতাত্ত্বিক নোয়াম চমস্কিদ্দ ছাত্র।

মুন্ডুরুকুদের মধ্যে ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজটি ছিল পিকার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে অন্যতম। চেনা পৃথিবী ছেড়ে সেখানে পৌঁছনোই তো বিরাট অ্যাডভেঞ্চার! পারার পশ্চিম অংশে এলাকার সবচেয়ে নিকটের এয়ারপোর্টটি আছে একটি ছোট্ট শহর সাতারে (Santarm)-তে। অ্যামাজনের এই অঞ্চল থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের দূরত্ব মোটামুটি ৫০০ মাইল। সাতারে থেকে ফেরিতে চেপে তাপাজোস নদী ধরে ১৫ ঘন্টায় প্রায় ২০০ মাইল পাড়ি দিয়ে পিকা পৌঁছুলেন ইতাইতুবা-তে। এককালে গোল্ড-রাশ টাউন হিসাবে পরিচিত ছিল ইতাইতুবার। খাবারদাবার, জ্বালানী ও দীর্ঘ ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করার এটাই শেষ জনপদ, তারপর থেকে আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্করহিত জীবন কাটাতে হবে তাঁকে। একটি জিপ ভাড়া করে তাতে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তুলে দিলেন পিকা, যার মধ্যে আছে জামাকাপড়, কিছু শুকনো খাবারদাবার, সোলার প্যানেল, ব্যাটারি, কম্পিউটার, বইপত্র এবং ১২০ গ্যালন পেট্রোল। এবার ইতাইতুবা থেকে ট্রান্স-অ্যামাজন হাইওয়ে ধরে এগিয়ে যেতে হবে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। সেই ১৯৭০ সালে তৈরি এই রাস্তাটি নামেই হাইওয়ে, কোথাও কোথাও কাদা হয়ে গাড়ি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এই পথেই ২০০ মাইল এগিয়ে পৌঁছনো গেল জাকারিয়াকাঙ্গাতে। এই জাকারিয়াকাঙ্গার পর থেকেই শুরু হয় মুন্ডুরুকুদের এলাকা। এখানেই পিকা অপেক্ষা করেছিলেন আদিবাসীদের জন্য। দীর্ঘ অপেক্ষার পর একসময় ওদের ক্যানতে (ছোটো নৌকো) চেপে বসলেন তিনি। এভাবেই অ্যামাজনের এক আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিতে ঢুকে পড়েছিলেন পিয়ের পিকা।

মজার ব্যাপার হল মুন্ডুরুকুদের মাঝে কয়েক মাস কাটিয়ে নিজের দেশ ফ্রান্সে ফিরে পিকা বুঝতে পারলেন সময় ও সংখ্যার ধারণা তিনি গুলিয়ে ফেলেছেন। তাঁর নিজের ভাষায়- "অ্যামাজন অঞ্চল থেকে ফিরে আমি সময় ও সংখ্যার অনুভূতি এবং সম্ভবত স্থানের ধারণাও হারিয়ে ফেলেছিলাম।

প্যারিসের জীবনযাত্রা, সরলরেখা, কোন, ইত্যাদির সঙ্গে মানিয়ে নিতে খুব সমস্যা হয়েছিল আমার।" আসলে মুন্ডুরুকু সংস্কৃতিতে পরিমাণগত তথ্যের কোনো প্রয়োজন নেই। সেখানে থাকাকালীন পিকাও শিকারে যেতেন, আর্মাডিলো, তাপির বা বুনো শুয়োরের মাংস খেতেন, হ্যামক-এ ঘুমোতেন, সময় সম্পর্কে ধারণা পেতে আকাশে সূর্যের অবস্থান দেখে নিতেন, বৃষ্টি হলে ঘরে বসে থাকা, আর রৌদ্রজ্জ্বল দিনে বাইরের কাজকর্ম করা। দৈনন্দিন জীবনের কোনো প্রয়োজনে সেখানে হিসাবনিকাশ বা সংখ্যার প্রয়োজন নেই। সেই কারণেই ফিরে এসে তিনি কিছুতেই মনে করতে পারলেন না ইতাইতুবা থেকে জাকারিয়াকাঙ্গা যেতে তাঁর কত সময় লেগেছিল অথবা জাকারিয়াকাঙ্গায় কতক্ষণ অপেক্ষার পর মুন্ডুরুকুরা তাঁকে নিতে এসেছিল। যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল- জাকারিয়াকাঙ্গা থেকে মুন্ডুরুকুদের গ্রামে যেতে কত সময় লেগেছিলে? উত্তরে একটু বিড়বিড় করে তিনি বলেছিলেন- "এটা নির্ভর করে! আমি জানি না। মনে হয় . . . হয়ত . . . দুদিন . . . একদিন ও এক রাত . . ."।

পিকার এই জবাব আমাদের অনেকেরই অস্বাভাবিক মনে হয়। সংখ্যা ও গণনা ছাড়া একটা জাতি কী করে বেঁচে থাকে? কীভাবে চালিয়ে নেয় তাদের প্রাত্যহিক যাবতীয় কাজকর্ম? প্রয়োজনীয়তার নিরিখেও তো ন্যূনতম হিসাবনিকাশ দরকার! ধরা যাক কোনো পরিবারে দশজন সদস্য, তাহলে খাবার পাতে দশটা ডিমের দরকার। অতএব বাড়ির গৃহিণীকে কমপক্ষে দশটা ডিম রান্না করতেই হবে। হিসেব না থাকলে চলবে কী করে? অথচ মুন্ডুরুকুদের সমাজে এই সমস্যাই তৈরি হয় না। আহার্য সংগ্রহের পর সেটাই সবাই মিলে খায়, আলাদা পাত্রে সমবণ্টনের প্রয়োজনীয়তা ওদের নেই। এমনকি কোনো মায়ের হয়তো ছটি সন্তান আছে। তাকে যদি বলা হয়- আপনার কজন সন্তান? উত্তরে তিনি হয়তো বলবেন- "জানি না।" কারন জানার দরকারই হয় না। ওদের সংস্কৃতিতে সন্তান হল সমাজের অংশ, আর সমাজের সবাই শিশুদের বড়ো করার দায়িত্ব পালন করে, তাই বাবা-মাকে নিজেদের সন্তান নিয়ে আলাদা কোনো কিছু করতে হয় না, ফলে গুনে দেখারও কোনো প্রয়োজন পড়ে না। একটু চিন্তা করে দেখুন তো পৃথিবীতে অন্যান্য প্রাণীসমাজের সঙ্গে মিল আছে কিনা! তাহলে সভ্য মানবসমাজ গড়তে গিয়ে আমরাই কি প্রাকৃতিক নিয়মকানুনের বারোটা বাজিয়ে দিলাম?

সংখ্যা নিয়ে মুন্ডুরুকুদের ধারণা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন পিকা। আমরা যেমন দৈনন্দিন কাজকর্মের স্বাভাবিকতায় দৈর্ঘ্য মাপার ফিতে, স্কেল বা গ্রাফ ব্যবহার করি, ঠিক একই অবস্থায় ওরা কী করবে? ধরা যাক অনেকগুলি ছোট প্লাস্টিকের বল নিয়ে সেগুলিকে এক লাইন বরাবর এমনভাবে সাজিয়ে রাখতে বলা হল, যাতে প্রথমে একটা এবং সবার শেষে দশটা বল থাকে। আমাদের এই কাজটা করতে বললে প্রায় সবাই লাইন বরাবর সমদুরত্বে বলগুলি সাজিয়ে রাখবো। শুধু আমরা কেন সাধারণভাবে যেকোনো শিক্ষিত আমেরিকান বা ইউরোপীয় ব্যক্তিই তাই করবেন। মুন্ডুরুকুরা কিন্তু কেউ তা করলেন না, ওদের ধারণা অনুযায়ী ছোটো থেকে বড়োর দিকে গেলে পরপর দুটি সংখ্যার মধ্যবর্তী দূরত্ব ক্রমশ কমতে থাকে। অর্থাৎ লাইন বরাবর একটি এবং দুটি বলের দূরত্ব ছটি ও সাতটি বলের মধ্যেকার দুরত্ব বা আটটি ও নয়টি বলের মধ্যেকার দুরত্ব অপেক্ষা বেশি। কি শুনতে অবাক লাগছে না? আসলে দূরত্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেকটাই বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষার ফসল, যেখানে একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যকে একক ধরে নিয়ে তার গুনিতক হিসাবে দুরত্বের পরিমাপ করা হয়; আর বিজ্ঞান শিক্ষায় ব্যবহৃত মাপজোকও তো সেই যুক্তিই ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ আমাদের চেনা দুনিয়ায় সংখ্যারা স্কেল বরাবর সমভাবে বিন্যস্ত, যাকে আমরা সরলরৈখিক স্কেলিং সিস্টেম বলতে পারি। অন্যদিকে যেখানে মান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাদের মধ্যেকার দূরত্ব কমে আসতে থাকে সেটাকে বলে লগারিদমিক স্কেলিং সিস্টেম। অ্যামাজন উপত্যকার ওই আদিবাসীরা লগারিদমিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে দুনিয়াকে দেখতে অভ্যস্ত। শুধু মুন্ডুরুকুরাই নন, ২০০৪ সাল নাগাদ রবার্ট সেইগলার এবং জুলি বুথ নামে আমেরিকার কার্নেগী মেলন ইউনিভার্সিটির দুই গবেষক শিশুদের মধ্যে লাইন ও সংখ্যা নিয়ে প্রায় একই রকম একটি পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। যাদের মধ্যে কিন্ডারগার্টেন (গড় বয়স ৫.৮), ফার্স্ট গ্রেড (গড় বয়স ৬.৯) এবং সেকেন্ড গ্রেড (গড় বয়স ৭.৮)-এ পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা ছিল। সেখানেও তাঁরা দেখেছিলেন কিন্ডারগার্টেনের শিশুরা যাদের প্রথাগত গণিত শিক্ষা আরম্ভ হয় নি, তারা লগারিদমিক স্কেলিং সিস্টেম ফলো করছে, ফার্স গ্রেড থেকে শিশুদের মধ্যে কিছুটা করে সরলরৈখিক স্কেলিং-এর ধারণা দানা বাঁধছে, আর সেকেন্ড গ্রেডে উঠে ওরা আমাদের মতোই সরলরৈখিক স্কেলিং সিস্টেমের যৌক্তিকতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে।

এবার প্রশ্ন হল আদিবাসী জনজাতি এবং শিশুরা লগারিদমিক স্কেলিং সিস্টেম ফলো করতে যায় কেন? আসলে পরিমাণের অনুপাতের নিরিখে ওরা জগতকে বিচার করে। এখানে পাঁচটি বল একটি বলের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি এবং দশটি বল পাঁচটি বলের চেয়ে দুই গুণ বেশি। তাই ওদের ধারণায় এক ও পাঁচের মধ্যের দুরত্বের চেয়ে পাঁচ ও দশের মধ্যে দুরত্বের ব্যবধান কম। আর এই অনুপাতের নিরিখে বিচার করে বলেই শিশু বা মুন্ডুরুকু, যাদের কাছে সংখ্যার ধারণা নেই, তারা সবাই লগারিদমিক স্কেলিং সিস্টেম অনুসরণ করে। ধরা যাক তো দুটো গাছে প্রচুর আম ধরে আছে; একবার দেখে নিয়েই তো বলে দেওয়া যায় কোনটিতে বেশি আম আছে, সেখানে একটি একটি করে গুনে দেখার প্রয়োজন হয় না; অর্থাৎ অনুপাতের ধারনাই এখানে যথেষ্ট। আবার দুরত্বের ব্যাপারেও লগারিদমিক স্কেলের কার্যকরী প্রয়োগ দেখা যায়, পরিভাষায় যাকে বলে 'পারস্পেক্টিভ'। যদি ৫০ মিটার পর পর এক লাইনে অনেকগুলো বিদ্যুতের খুঁটি থাকে, প্রথম দুটো খুঁটির মধ্যেকার যে দূরত্ব, যত দূরে তাকানো যায় আপাত দৃষ্টিতে সেই খুঁটিগুলোর মধ্যেকার দূরত্ব যেমন ক্রমশ কমতে থাকে, খুঁটির উচ্চতাও তেমনি কম বলে মনে হয়। একেই বলে পারস্পেক্টিভ ভিউ। সংখ্যার সঠিক ধারণা না থাকায় মুন্ডুরুকুরা এই দৃষ্টিতেই জগতকে দেখতে অভ্যস্ত।

অন্যদিকে আমাদের দুনিয়ায় লিনিয়ার স্কেলিং সিস্টেম থাকলেও এবং লগারিদমিক সিস্টেমকে আমরা পুরোপুরি বিসর্জন দেই নি। যেমন সময়ের চলে যাওয়া আমাদের কাছে লগারিদমিক প্রকৃতির। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অনুভব আরও দৃঢ় হয় বলেই আমরা মনে করি- 'দেখতে দেখতে একটি বছর কেটে গেল'। আবার উল্টোটিও হয়; যেমন চলে যাওয়া গত কালটিকে পুরো সপ্তাহের চেয়ে দীর্ঘতর বলে মনে হয়। তবে আসল কথা হল সঠিক সংখ্যার বদলে অনুপাতের উপর নির্ভরশীলতা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য এবং মুন্ডুরুকু বা অন্যান্য প্রাণীদের বেঁচে থাকার নিরিখে এই অনুভবই যথেষ্ট। তাহলে দেখা যাচ্ছে সঠিক সংখ্যার অনুসরণ আমাদের সভ্য সংস্কৃতির ফসল। মানুষের দুনিয়াদারীর মূলেও কি এই সংস্কৃতি? বলতে চাইছি, মানুষের মস্তিস্কের এই যুক্তিবোধই কি আমাদেরকে জীবকুলের অন্যান্য সদস্যদের চেয়ে এগিয়ে রেখেছে?

লেখক বিজ্ঞানের শিক্ষক এবং বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক
email: @acnbu13gmail.com • M. 8967965340

বিশেষ রচনা : জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

ডা. সু কা ন্ত মু খো পা ধ্যা য়

বিপন্ন প্রাণী সংরক্ষণের দিশারী জেরি ডারেল

প্রথাগত কোন স্কুল কলেজের ডিগ্রি না থাকায় যাঁকে একসময় সামান্য কাজের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়েছিল কে জানত যে স্বশিক্ষিত সেই ছেলেটিই ভবিষ্যতে হয়ে উঠবেন বিপন্ন প্রাণীদের রক্ষাকর্তা আর সারা পৃথিবীতে প্রাণী সংরক্ষণের পথিকৃৎ! বিস্ময়কর এই ইংরেজ প্রকৃতিবিদ একাধারে ছিলেন প্রাণী সংরক্ষক, অনেকগুলি জনপ্রিয় বইয়ের লেখক, রেডিও টেলিভিশনের নিয়মিত সংরক্ষণ সচেতক বক্তা সর্বোপরি সারা পৃথিবীর হাজারেরও বেশি পশুশালার সংরক্ষণ প্রশিক্ষক যাঁর হাত ধরে বিপন্ন প্রাণী সংরক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিল গোটা বিশ্ব।



পৃথিবীর প্রথম "সংরক্ষিত প্রাইভেট জু" এর মালিক এই মানুষটির পুরো নাম জেরাল্ড ম্যালকম ডারেল, সাধারণ্যে পরিচিত জেরি ডারেল (Gerald Durrell) নামে। বাবার নাম স্যামুয়েল মা লুইসা। ভারতের জামশেদপুরে জেরির জন্ম হয়েছিল ৭ জানুয়ারি ১৯২৫ সালে। চার ভাইবোনের সবার ছোট জেরি খুব ছোট থেকেই পশুপাখিপ্রেমী ছিলেন—তাদের লালনপালন করাই ছিল তাঁর একমাত্র শখ।

১৯২৮ এ বাবার মৃত্যুর পর মা পরিবার নিয়ে ফিরে যান দক্ষিণ লন্ডনের আপার নরউডে। ছোট্ট জেরি স্কুলে গেলেও অসুস্থতার কারণে পড়াশুনো বিশেষ হয়নি। ১৯৩৫ এ মা গ্রীসের কর্ফু দ্বীপে বড় ছেলে লরেন্সের কাছে চলে যান। জেরির পড়াশোনা চলল বাড়িতেই আর আলাপ হল থিয়োডোর স্টেফানিডসের সঙ্গে যিনি ছিলেন চিকিৎসক, বিজ্ঞানী এবং প্রকৃতিপ্রেমিক। তাঁর সঙ্গে জেরি কখনও একা কখনও দু'জনে মিলে নির্জন দ্বীপে ঘুরে ঘুরে গিরগিটি, টিকটিকি, কচ্ছপ বা অসুস্থ পাখি আর নানা জন্তুকে বাড়িতে এনে পরিচর্যা করতেন। গুরু তাঁকে যত্ন করে শিখিয়ে দিলেন কিভাবে প্রাণীদের নানা গতিবিধি আচার আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে হয়, তারা কি কি খাবার খায়, কখন বাচ্চা দেয় এইসব খুঁটিনাটি নানা তথ্য। জেরি পরে বলেছিলেন যে গুরুর শিক্ষা আর ফরাসী প্রকৃতিবিদ জ্যাঁ হেনরি ফেবার তাঁর জীবন বদলে দিয়েছিল।

কর্ফু দ্বীপের অভিজ্ঞতা পরে তাঁর লেখা বইয়ে স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্থির সময়ে জেরি ইংল্যান্ডেই ফিরে হুইপস্নেডের পশুশালায় জুনিয়ার কীপারের কাজ পান। সেখানে দেখলেন জিরাফের গলা ব্যথা হওয়ায় তাকে গরম জল পান করতে দেওয়া হয়েছিল! চাকরি ছেড়ে ১৯৪৭ সালে পশ্চিম আফ্রিকার ক্যামেরুন দ্বীপে এক অভিযানে গিয়ে শিম্পাঞ্জিসহ বেশ কিছু প্রাণী সংগ্রহ করে কয়েকটা চিড়িয়াখানায় বিক্রি করে কিছু টাকা রোজগার করলেন। সেকালে এইভাবেই প্রাণী সংগ্রহ করার রীতি ছিল।

পরে কয়েকবার এমন অভিযান করলেও এইভাবে রোজগার তাঁর পছন্দ ছিল না। মনে হত বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় যে পদ্ধতিতে পশুপাখিদের পরিচর্যা করা হয় তা উপযোগী নয় তাই মনে অদম্য এক বাসনা ছিল নিজের চিড়িয়াখানা তৈরি করা যেখানে স্বাধীনভাবে বিভিন্ন প্রাণীদের সঠিক পরিচর্যা করা যায়। কিন্তু দরকার প্রচুর টাকা।

১৯৫১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী জেরি বিয়ে করেন জ্যাকেলিন উলফডেনকে যিনি পরে নিজস্ব চিড়িয়াখানা তৈরিতেও বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন।

বড়দা লরেন্সের পরামর্শমত জেরি বই লিখতে শুরু করেন। প্রথম বই—'দ্য ওভারলোডেড আর্ক' ভীষণভাবে জনপ্রিয় হওয়ায় বেশ কিছু টাকা পেয়ে ১৯৫৬ য় লেখেন— 'মাই ফ্যামিলি এন্ড আদার এনিম্যালস' তাঁর ছোটবেলার আর কর্ফু দ্বীপের স্মৃতি নিয়ে লেখা। ব্যস জেরি প্রতিষ্ঠিত লেখকের স্বীকৃতি পেয়ে গেলেন।

১৯৫৭ সালে জেরি ক্যামেরুন অভিযানে যান মূলত নিজের চিড়িয়াখানার জন্য প্রাণী সংগ্রহ করতে। এই অভিযান নিয়ে এক তথ্যচিত্রের জন্য ও রেডিওর এক প্রোগ্রাম জেরিকে বিবিসি-র ন্যাচারাল হিস্ট্রি ইউনিটের সঙ্গে আজীবন সংযোগ স্থাপন ও সেইসঙ্গে অর্থ সংগ্রহে সহায়ক হয়েছিল।

সংগৃহীত কিছু প্রাণী তিনি রেখে দিলেন। সেইসঙ্গে হন্যে হয়ে নিজের চিড়িয়াখানার উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে লাগলেন।



দীর্ঘদিন থেকেই ডারেল খুঁজছিলেন এমন একটি উপযুক্ত জায়গা যেখানে অন্তত পৃথিবী থেকে ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসা রাইনো, টেপির, নীলতিমি, নীলগাই, ইগুয়ানা, আসামের পিগমি শুয়োর, সোনালি বিড়াল,

উড়ন্ত ইঁদুর, আর্জেন্টিনার ভ্যাম্পায়ার বাদুড়, মরিশাস দ্বীপের গোলাপি পায়রা বা মাদাগাস্কারের লেমুর এমনতর অসংখ্য প্রাণীকে উপযুক্ত পরিবেশে রেখে বাঁচিয়ে রাখা যায় আর বংশবিস্তারও করা যায় কারণ সামান্য দু'একটা প্রাণীকে নিয়ে এসে শুধু সংরক্ষণ করলে কোন লাভ নেই। পাশাপাশি মানুষকেও বোঝাতে হবে এদের রক্ষা করার কথা কারণ এরা পৃথিবীর বৃহত্তর ইকোসিস্টেমের অংশ। শুধু রাখলেই হবে না তাদের উপযুক্ত দেখভাল, পরিচর্যা এসবও করতে হবে আর তার সঙ্গে দরকার নিবিড় পর্যবেক্ষণ কারণ ভুল হলেই সর্বনাশ—নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা অসম্ভব। এই কারণের জন্যই জেরি ডারেল এক স্মরণীয় নাম হয়ে রয়ে গেছেন প্রাণী সংরক্ষণের ইতিহাসে।

১৯৫৮ সালে জার্সি দ্বীপে তিনি খুঁজে পেলেন ষোড়শ শতকের পরিত্যক্ত এক প্রাসাদোপম ম্যানর হাউসের, সামনে মস্ত বাগান আর সমুদ্রের সঙ্গে যোগ থাকায় জলের বন্দোবস্ত তো আছেই। অবিলম্বে লিজ নিয়ে নিলেন আর ১৯৫৯ সালের ২৬ মার্চ জেরি ডারেলের সাধের বিপন্ন প্রাণীদের রক্ষণশালা জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হল। সেই প্রথম কোন সরকার অনুমোদিত "প্রাইভেট" সংরক্ষণশালা। ১৯৬২ থেকে ৭৭ এই সময়কালে ডারেল অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, সিয়েরা লিওন, কুইন্সল্যান্ড, মরিশাস মেক্সিকো এইসব দেশে অভিযানে গিয়ে যা দেখলেন তা বিস্ময়কর। বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাণীদের রক্ষার কোন চিন্তাভাবনাও কেউ করে না ! অথচ দিনদিন তাদের সংখ্যা কমে আসছে। দেখেশুনে ডারেল ৬ জুলাই ১৯৬৩ সালে তাঁর চিড়িয়াখানার নতুন নাম দেন—Jersey Wildlife Preservation Trust.

অক্লান্ত চেষ্টায় আর পরিশ্রমে আস্তে আস্তে অর্থসাহায্য আসতে লাগল, বহু বিশিষ্ট মানুষ এগিয়ে এলেন ট্রাস্টের কাজে। জেরি নিজে বিভিন্ন দেশে গিয়ে সেখানকার সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে বিপন্ন প্রাণীদের রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝাতে লাগলেন। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে একসময় প্রচুর "সেন্ট লুসিয়ান প্যারট" নামে চমৎকার এক পাখির দেখা মিলত। মাংসের লোভে ১৯৭৫ নাগাদ পাখির সংখ্যা গুণে দেখা গেল মোটে শ'খানেকে এসে ঠেকেছিল। ডারেল সাতটি পাখি সঙ্গে নিয়ে গেলেন, সঙ্গে ওই দ্বীপেরই জনা দুয়েক অধিবাসী যারা তাঁর কাছে থেকে হাতেকলমে শিখবে কিভাবে ওই পাখিদের পরিচর্যা করতে হয়। মাত্র চার বছর পর পাখির সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ মানে দ্বিগুণ আর বছর দশেক বাদে ৩০০টি।

একই পদ্ধতিতে তিনি মরিশাসের কেসট্রেল আর গোলাপি পায়রাদেরও সংখ্যাবৃদ্ধি করেছিলেন। কয়েক বছরের প্রচেষ্টায় মাত্র ৪টি কেসট্রেল থেকে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩০০টি আর গোলাপি পায়রা ২০ থেকে বেড়ে হয় ১৬৫টি। এরমধ্যেই জেরির স্ত্রী জ্যাকি ১৯৭৯-তে তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে লী ম্যাকজর্জকে বিয়ে করেন কারণ বিশাল কর্মকান্ড একার পক্ষে চালানো সম্ভব ছিল না।

মৃত্যুর আগে জেরি ডারেল যেসব কাজ করেছিলেন তার মধ্যে ছিল অজস্র বই লেখা, রেডিও টেলিভিশনে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অনুষ্ঠান করা, নানা দেশে গিয়ে কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আর যেখানে যত বিপন্ন প্রাণী আছে তাদের রক্ষা নিয়ে মানুষকে সচেতন করা।

প্রাণী সংরক্ষণবিদ ইউলিসিস সীল এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন আমি পৃথিবীর ৪০টি দেশে অন্তত একজন প্রকৃতিবিদকে পেয়েছি যিনি জেরির কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। সর্বত্র মানুষ তাঁকে শুধু এই কারণেই সম্মান করে যে লুপ্তপ্রায় প্রাণীদের কিভাবে সংরক্ষণ করা উচিত তা তিনি বিশাল সংখ্যক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ডারেল কমপক্ষে হাজারখানেক মানুষকে প্রশিক্ষিত করেছিলেন। জামাইকার "হোপ" পশুশালার অধিকর্তা রীমা কার ১৯৮৯ সালে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন 'জার্সিতে ডারেলের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে এখানে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ইগুয়ানার সংখ্যা মাত্র ১৫ থেকে বাড়িয়ে একশোয় নিয়ে যেতে পেরেছি'।

জার্সি দ্বীপে তাঁর সংগ্রহশালার একেবারে প্রবেশপথেই বসানো আছে চমৎকার এক ডোডো-র মূর্তি। মরিশাসের এই প্রাণী শুধুমাত্র মাংসের লোভে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

এক সাক্ষাৎকারে জেরি একটি কথা বলেছিলেন 'সকলেই আমায় জিজ্ঞেস করে পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য আমি কি করতে পারি? আমি তাদের বলি তোমাদের যা ভাল মনে হয় তাই কর। মনে কর তুমি লিখতে পার, তোমার চারপাশে যা ঘটছে তাই লেখ। সকলকেই যে পশুপক্ষীবিশারদ হতে হবে এমনটা নয়। সবাই যদি নিজের নিজের মত চেষ্টা করে তাহলে সেই সম্মিলিত চেষ্টাই আমাদের পরিবেশটা পালটে দেবে।'

জেরি তাঁর কাজের জন্য অসংখ্য পুরস্কারও পেয়েছেন। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য ইউনাইটেড নেসশন এর Roll of Honour for Environmental Achievement 1988, যা ১৯৯২ সাল পর্যন্ত মাত্র পাঁচশোজন বিশেষ ব্যক্তিকেই দেওয়া হয়েছিল। টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেন্ট লিখেছিল—If animals birds and insects could speak they would award Mr. G.Durell one of their first Nobel prizes. তবে সবকিছুকেই ছাপিয়ে গেছে তাঁর জীবদ্দশাতে কেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের চালু করা Durell Institute of Conservation and Ecology—প্রথম প্রাণী সংরক্ষণ বিষয়ে ইংল্যান্ডে একেবারে স্নাতক স্তরের পাঠ্যক্রম।

১৯৯৫ সালে ৩০ জানুয়ারি ৭০ বছর বয়সে জেরি ডারেলের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর ১৯৯৬ সালেই প্রাণী সংরক্ষণে উৎসাহ দেওয়ার জন্য চালু হয় 'ডারেল মেমোরিয়াল ফান্ড'। গ্রীসের কর্ফু দ্বীপে ডারেলের নামে ২০০২ সালে একটি স্কুলসহ সংরক্ষণের কোর্স চালু হয়।

মৃত্যুর পর জেরাল্ড ম্যালকম ডারেলের স্মৃতিকে সম্মান জানাতে নতুন আবিষ্কৃত বেশ কিছু লুপ্তপ্রায় প্রাণীর নাম রাখা হয়েছে তাঁর নামে যেমন ইকুয়েডরে প্রাপ্ত বিরল প্রজাতির এক ব্যাঙের নাম ২০০৫ সালে রাখা হয়েছে সেন্টোলিন ডারেলোরাম—জেরি ও তাঁর স্ত্রীর নামে।

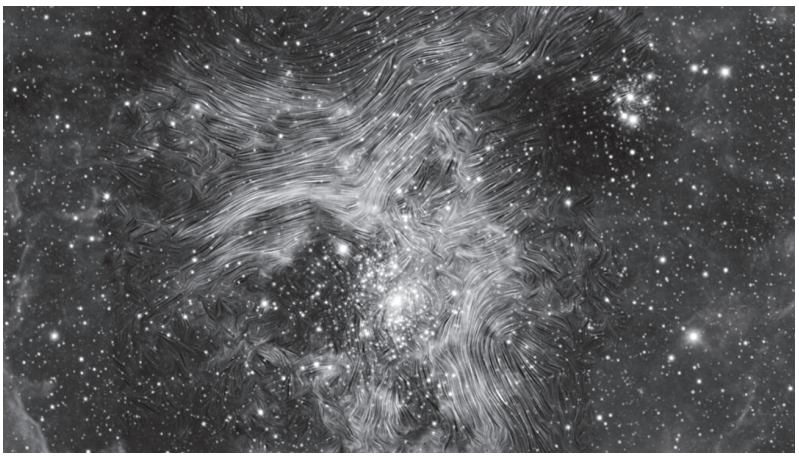
বর্তমানে উষ্ণায়ন, জনবিস্ফোরণ, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, বিপুল বনাঞ্চল ধ্বংস, প্লাস্টিকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার সর্বোপরি পশুপাখিদের প্রতি চরম উদাসীনতার পরিণামে বহু প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করলে মানুষের সভ্যতাই একদিন বিনষ্ট হয়ে যাবে। জেরি ডারেল তাঁর সারা জীবনের কর্মকান্ড দিয়ে বিশ্বের কাছে এক অমূল্য বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন—প্রাণীরা আসলে ভালবাসা চায়, তারাও চায় মানুষের সঙ্গেই এই রোদ, জল, হাওয়ার পৃথিবীতে একইসঙ্গে টিকে থাকতে কারণ প্রাকৃতিক ভারসাম্য ঠিক রাখতে তাদের বেঁচে থাকা প্রয়োজন।

লেখক চিকিৎসক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: sukanta60@gmail.com • M. 7001223049

তন্ময় ধর

উর্ণনাভ নীহারিকার অন্দরে



উজ্জ্বলতা, ওজন, বিস্তৃতি ইত্যাদির নিরিখে যদি নীহারিকাদের বিচার করা হয়, তবে সব ক্ষেত্রেই চমকে দিতে পারে উর্ণনাভ নীহারিকা (*Tarantula nebula*)। এই নীহারিকাটি যদি কালপুরুষ নীহারিকার মতো দূরত্বে থাকত, তাহলে পৃথিবীর মাটিতে সে ছায়া ফেলতে পারত। আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সিতে নয়, অতিকায় এই নীহারিকার অবস্থান আমাদের প্রতিবেশী গ্যালাক্সি বৃহৎ ম্যাগেলানীয় মেঘে (Large magellanic cloud)। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১৬০০০০ আলোকবর্ষ। দক্ষিণ আকাশের সুবর্ণাশ্রম তারামন্ডলের (Constellation Dorado) গভীরে দৃশ্যমান এই গ্যালাক্সি। অতিবৃহৎ এই নীহারিকার ভর ৫০০০০০ সৌরভর, এর পাশে আমাদের পরিচিত নীহারিকা কালপুরুষ (ভর = ২০০০ সৌরভর), কর্কট (ভর = ৬.৫ সৌরভর) নেহাতই শিশু। আরো বড় রহস্য লুকিয়ে আছে এই নীহারিকাটির শরীরের ভেতর। নীহারিকাটির মধ্যে অতিকায় কয়েকটি তারকা আছে যাদের ভর তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। 'R 136A' নামক একটি তারকাস্তবকের মধ্যে 'R 136A' নামক একটি তারার ভর এবং উজ্জ্বলতা সূর্যের উজ্জ্বলতার ৮৭০০০০০০ গুণ। এখানেই শেষ নয়, ওই তারাটির নাকি জন্মকালে ভর ছিল ৩২০ সৌরভর। শুধু তাই নয়, ওই নক্ষত্রস্তবকেই মাত্র ১৭ আলোকবর্ষ পরিমিত স্থানের মধ্যে ৭২টি অতিকায় এবং অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র রয়েছে যাদের ভর এবং ঔজ্জ্বল্যের তুলনা গোটা ব্রহ্মান্ডে মেলা ভার। আরও বিশদে দেখলে মাত্র ১ আলোকবর্ষ পরিমিত স্থানে ৪০টি এমন অতিকায় নক্ষত্র রয়েছে যাদের প্রত্যেকের ভর ৫০ সৌরভরের বেশি।

কেন্দ্রীয় অংশে 'R 136A' যেন উজ্জ্বল এক আলোকগ্রন্থি যাতে আটটি অত্যন্ত ভারী তারকা যেন গ্রন্থিবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। ব্রহ্মান্ডে আর কোথাও এমন গাদাগাদি অবস্থায় এমন দৈত্যাকার তারকা নেই। 'R 136A' বেশিরভাগ শক্তি উৎপন্ন করে যা ট্যারান্টুলা নেবুলাকে দৃশ্যমান করে। ক্লাস্টারটির আনুমানিক ভর হল ৪৫০০০০ সৌর ভর, এটি ভবিষ্যতে একটি গ্লোবুলার ক্লাস্টারে পরিণত হতে পারে। আর ১৩৬-এর ঘনত্ব একটি সাধারণ OB অ্যাসোসিয়েশন যেমন সিগনাস OB2-এর নাক্ষত্রিক ঘনত্বের প্রায় ২০০ গুণ। আর ১৩৬ অঞ্চলটি ২০ লক্ষ বছরেরও কম বয়সী বলে মনে করা হয়। সদস্য নক্ষত্রগুলির মধ্যে কোনটিই উল্লেখযোগ্যভাবে বিবর্তিত হয়নি এবং কোনটিই সুপারনোভা হিসাবে বিস্ফোরিত হয়েছে বলে মনে করা হয় না। উজ্জ্বল নক্ষত্র হল WNh, O supergiants এবং OIf/WN স্ল্যাশ স্টার, সবগুলোই অত্যন্ত বিশাল সম্পূর্ণ পরিবাহী নক্ষত্র। ক্লাস্টারের মধ্যে কোন লাল সুপারজায়েন্ট, ব্লু হাইপারজায়েন্ট বা উজ্জ্বল নীল ভেরিয়েবল নেই। ক্লাস্টারের উপকণ্ঠে অল্প সংখ্যক বি শ্রেণির তারা সনাক্ত করা হয়েছে। দৈত্যাকার তারকাদের দাপট থাকলেও গোটা নীহারিকা জুড়ে কিন্তু ক্ষুদ্র এবং বৃহতের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। উর্ণনাভের শরীর জুড়ে যে ৮২০০০০ তারকায় এযাবৎ সমীক্ষা চালানো হয়েছে, তার মধ্যে শতাধিক দৈত্যাকার তারকা থাকলেও সিংহ ভাগই কিন্তু সূর্য জাতীয় ছোট তারা। মহাকাশের সর্বাধিক সক্রিয় নক্ষত্র সৃষ্টিকারী এই নীহারিকার জন্ম আজ থেকে মাত্র ২-৩ কোটি বছর আগে। ব্রহ্মান্ডের বিবর্তনের নিরিখে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এই ক্ষুদ্র পরিসরে অন্ততপক্ষে ৪০ থেকে ৬০টি সুপারনোভা বিস্ফোরণ হয়েছে। ওই বিস্ফোরণসঞ্জাত শক ওয়েভের দাপটেই নীহারিকার মধ্যে নক্ষত্র সৃষ্টির অমন বাড়বাড়ন্ত।



এবার এর আবিষ্কারের ইতিহাস একটু জেনে নেওয়া যাক। ১৭৫১ সালে আফ্রিকার দক্ষিণতম প্রান্ত উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে ফরাসি জ্যোতির্বিদ নিকোলাস ল্যাকেইলির পর্যবেক্ষণে প্রথম ধরা পড়ে উর্ণনাভ নীহারিকা। তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণের বর্ণনায় লিখেছেন—'দুই ফুট টেলিস্কোপে দৃশ্যমান এক নীহারিকাসম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক যাতে কোন পৃথকীকৃত তারকা দৃশ্যমান নয়'। অতি-উজ্জ্বল এই নীহারিকার অন্দরে যে এত ঐশ্বর্য লুকিয়ে আছে, তা জানতে প্রায় দুই শতাব্দীকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে। সারা ব্রহ্মান্ডে তল্লাশি চালিয়ে এর জুড়ি পাওয়া যায়নি। নক্ষত্র সৃষ্টির সর্ববৃহৎ আঁতুড়ঘর হিসেবে স্বীকৃতি মিলেছে এই নীহারিকার। আর সেই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চলছে সারা পৃথিবী জুড়ে।

লেখক গবেষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: tstorm.tanmay@gmail.com • M. 9892359674

অ জ য় না থ

পরিবেশ দিবস এবং আমাদের ইতি কর্তব্য



৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। আমরা আমাদের পরিবেশ নষ্ট করেছি এবং প্রতি নিয়ত ধ্বংস করে চলেছি। একথা আমরা সবাই জানি এবং মেনে নিয়েছি কিন্তু মনে নিয়েছি কি? এই ভাবনা আজকের নয় প্রায় ৫৬ বছর আগে ১৯৬৮ সালে পরিবেশ নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। শুরু হয় পরিবেশ রক্ষা আন্দোলন। চার বছর পর ১৯৭২ সালে জাতিসঙ্ঘের পরিবেশ বিষয়ক স্টকহোম সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭৩সাল থেকে প্রতিবছর ৫ই জুন সংযুক্ত জাতিসংঘের পরিবেশ প্রকল্প বা ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (UNEP) এর নেতৃত্বে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়। জাতিসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, ব্যবসায়ীক সংগঠন যারা পরিবেশ নিয়ে চিন্তাভাবনা বা কাজ করে, তারা এইদিন জনসাধারণ এর মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মানুষের সাথে পরিবেশের সম্পর্ক বা নির্ভরতার চিন্তা থেকেই পরিবেশ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত।

এই পৃথিবী শুধু মানুষের জন্য নয়। পশু, পাখি, গাছ, মাছ, মানুষ - আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের ওপর নির্ভরশীল। গাছের দ্বারা উৎপন্ন অক্সিজেন যেমন প্রাণীর প্রয়োজন, তেমন গাছের বীজকে দূরে দূরান্তে ছড়িয়ে নতুন চারাগাছ তৈরিতে প্রাণী সহায়তা করে। উদ্ভিদ থেকে প্রাথমিক ভাবে প্রাণীরা খাদ্য সংগ্রহ করে। আবার প্রাণীর বর্জ্য মাটিতে মিশলে তা থেকে গাছ খাদ্যপ্রাণ সংগ্রহ করে। এই চক্রই বলে দেয়, একজন না থাকলে অন্য জনের অস্তিত্ব বিপন্ন। সমুদ্র দূষণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিশ্ব উষ্ণায়ন, বন্যপ্রাণ হত্যা, অরণ্য ধ্বংস জাতীয় পরিবেশগত সমস্যা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পরিবেশবান্ধব সংগঠনগুলির সৃষ্টি। প্রত্যেক বছর একএকটি বিষয় বেছে নিয়ে তার ওপর আলোচনা, প্রচার ও সচেতনতা তৈরি করা হয়। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ এর মূল আলোচ্য বিষয় 'আমাদের ভূমি' শিরোনামে প্রাকৃতিক ভূমি পুনরুদ্ধার, মরুপ্রসারণ রোধ এবং খরাক্লিষ্ট জমিকে পুনরায় চাষযোগ্য করে তোলা।

উপরের তিনটি সমস্যারই মূলে আছে জলের অপ্রতুলতা।আবার মাটি ও জলের সুষম চরিত্রের সাথে সম্পর্কিত উদ্ভিদ জীবন। গাছ যেমন মাটিকে ও তার অন্তর্গত জলকে ধরে রাখে, তেমন সেই জলও গাছকে খাদ্যপ্রাণ দিয়ে সতেজ রাখে। মরু বা খরাপ্রবণ অঞ্চলে যেমন গাছপালা জন্মায় না, তেমনই বেহিসাবি বৃক্ষছেদন এর ফলে সৃষ্টি হতে পারে মরুভূমি বা খরা প্রবণ অর্থাৎ বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল। উদ্ভিদ মাটি ও জলকে ধরে রেখে মাটির চরিত্র বজায় রাখে। তাই বলা যায় কৃত্রিম বনসৃজনই তিনটি সমস্যার অন্যতম সমাধান। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পুরুলিয়া জেলার মানবাজার -১ ব্লকের ঝাড়বাগদা গ্রামের অধিবাসীদের দ্বারা সৃষ্ট ২৭৫ একরের কৃত্রিম বনসৃজন যা আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত। ২০২৪এর পরিবেশ দিবস পালনের উদ্যোক্তা দেশ হলো সৌদি আরব।

'ভূমি পুনরুদ্ধার' হল পরোক্ষে সারা বিশ্বে জীব বৈচিত্রের সুরক্ষা এবং পুনরুজ্জীবন যা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।আমরা সময়কে ফিরিয়ে আনতে পারি না, তবে বনাঞ্চল বাড়াতে পারি, জলের উৎস পুনরুদ্ধার করতে পারি। আগামী দিনে মানব সভ্যতার দুই তৃতীয়াংশ মানুষ চাহিদামত জল পাবেন না।দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার দেশগুলি সঙ্কটজনক অবস্থার কাছাকাছি আছে। আমাদের দেশের বহু অঞ্চলে জল সঙ্কট ভয়ঙ্কর আকার নিয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলের সঞ্চয় দ্রুত কমে আসছে। নেমে যাচ্ছে বিপদজনক স্তরে। গত মার্চমাসে ব্যাঙ্গালুরুর মত হাই টেক শহরের জল সঙ্কট প্রায় বিপর্যয়ের আকার নিয়েছিল।

জলবায়ু পরিবর্তনের পাশাপাশি, অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন ও নগর উন্নয়ন, অপরিমিত বৃক্ষছেদন বা বনভূমি ধ্বংস, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দূষণ ও ভূমি উন্নয়নের জন্য এই সংকট। জলের ঘাটতি যেমন খাদ্য নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করছে, তেমন জীব বৈচিত্র্যকেও প্রভাবিত করছে যা আগামীদিনে আরও প্রকট হবে। তাই সমস্যা সমাধানের জন্য সামাজিক বন সৃজনের দিকেও নজর দিতে হবে।

মিষ্টি জলের বেশির ভাগটাই আসে মাটির নিচে থেকে। কিন্তু অত্যধিক ব্যবহার ও পূরণ না করার কারণে সেই জল বিপজ্জনক ভাবে কমে গেছে। উষ্ণায়নের জন্য সমুদ্রের জলের উষ্ণতা ও জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য সমুদ্রের নিকটবর্তী জনপদ বা কিছু ছোট ছোট দ্বীপের জনবসতি বিপদের সম্মুখীন। সেই সব অঞ্চলের মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিনত হচ্ছেন। জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়নের জন দায়ী বিভিন্ন কারণের মধ্যে ভূমিক্ষয় এবং মরুভূমির সম্প্রসারণ অন্যতম।

বিগত পাঁচ দশক ধরে পরিবেশ পালনের মাধ্যমে জন চেতনা বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। জলের অপচয় রোধের চেতনা বৃদ্ধি হলে জলের সঞ্চয় বাডবে। ২০২৪ সালের এপ্রিল এবং মে মাসে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে দিন ও রাতের তাপমাত্রা বেড়েছে। পূর্ব ভারতে তাপমাত্রা ৪৮ ডিগ্রি ও উত্তর, উত্তরপশ্চিম, পশ্চিম এবং মধ্য ভারতে তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রির কাছাকাছি রেকর্ড হয়েছে। যেভাবে দীর্ঘদিন ধরে তাপপ্রবাহ এবং উষ্ণ রাত মানুষকে সহ্য করতে হয়েছে তা অভূতপূর্ব। ফলে মানুষের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা ধীরে ধীরে বাড়ছে। হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বরের সাংস্কৃতিক সংগঠন রবিচক্র এবং ভ্রমণ আড্ডা যৌথভাবে পরিবেশ দিবস পালন করবে গঙ্গার ঘাটের কাছে। পরিবেশ সম্পর্কে বলার জন্য ও জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য বিশিষ্ট জন উপস্থিত থাকবেন। তাছাড়া বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রকল্প ও আইনি সহায়তায় সামাজিক বনসৃজনের মাধ্যমে কৃত্রিম বনাঞ্চলের সৃষ্টি করে মাটি বা ভূপ্রকৃতিকেকে রক্ষা করা সম্ভব। অরণ্য, জল ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষাতেই হলো পরিবেশ দিবস পালনের সার্থকতা। তবে শুধু পাঁচই জুন নয় বছরের বাকি ৩৬৪ দিনও আমাদের কাছে পরিবেশ দিবস হয়ে না উঠলে এবং সাধারণ মানুষের সহযোগিতা না থাকলে দিনটি আনুষ্ঠানিক হয়েই থেকে যাবে। কাজের কাজ কিছুই হবে না।

লেখক গবেষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: nathajoy@gmail.com • M. 9433802339

অনুসন্ধান

সৌ ম্য কা ন্তি জা না

চোখের আলোয় দেখে ওরা চোখের বাহিরে

রবি ঠাকুর লিখেছিলেন— 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে'। আমরা জানি, আমরা দিনের বেলা কোনও বস্তু দেখি সূর্যের আলোয়। আবার রাতে বিজলীবাতি বা কেরোসিনের বাতি কিংবা গ্যাস বাতির আলোতে দেখি। কিন্তু চোখের আলো কী? আবার সেই আলোতে দেখাও যায়? কবির রূপকার্থ বক্তব্য থেকে আসি বাস্তবের কথায়। এমন প্রাণী কিন্তু আছে যাদের চোখ থেকে বেরোনো আলো তাদের বাইরের বস্তুকে দেখতে সাহায্য করে। ব্যাপারটা কেমন হেঁয়ালি শোনাচ্ছে, তাই না? তাহলে এবার একটু খুলে বলি। এমন বেশ কিছু প্রাণী আছে যাদের আমরা দেখি রাত্রিবেলায় চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। সে-সব প্রাণী আমাদের পরিচিত, যেমন বিড়াল, গরু, ছাগল, ভেড়া, শেয়াল, খাটাশ, বাঘরোল ইত্যাদি। রাতে যখন আমরা বেরোই তখন হাতে টর্চ লাইট নিয়ে বেরোই অন্ধকারে পথ হাঁটার জন্য। কিন্তু ওই সব নিশাচর প্রাণীদের তো আর টর্চ লাইট নেই। তারা তাদের দুটো চোখকেই টর্চ লাইটের মতো ব্যবহার করে। তবে সেই ব্যবহার প্রকৃত টর্চ লাইটের মতো নয়। চোখের ভেতর কীভাবে আলো তৈরি হয় আর কেনই বা তৈরি হয় সহজ কথায় জেনে নেওয়া যাক।

সবার চোখের ভেতরে পেছন দিকে একটা স্তর আছে। তাকে আমরা বলি রেটিনা। এই স্তরে আলোর গ্রাহক কোশ রয়েছে। এই কোশগুলো দু'রকমের হয়। এক ধরনের কোশকে বলে রড কোশ (Rod cell)। এরা মৃদু আলোর অনুভূতি গ্রহণ করে। আর এক ধরনের কোষ আছে, তার নাম কোন কোশ (Cone cell)। এরা উজ্জ্বল আলোর অনুভূতি গ্রহণ করে। বিড়াল জাতীয় প্রাণীদের রেটিনাতে রড কোশ রয়েছে মানুষের তুলনায় বেশি। তাই যে আলোতে মানুষ ভালো দেখতে পায় না সেই আলোতে বিড়াল জাতীয় প্রাণীরা বেশ স্পষ্ট দেখে। ওদের রেটিনার মধ্যে যে আলো পৌঁছায় তার অনুভূতি রড কোশ গ্রহণ করে, আর তা অপটিক স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে মস্তিষ্কে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু খুব কম আলোতে ভালোভাবে দেখতে পাওয়ার জন্য এদের আরও একটা ব্যবস্থা আছে। এদের রেটিনার পেছনে রয়েছে আয়নার মতো একটা স্তর। এই স্তর কেলাসাকার কোশ দিয়ে তৈরি ফলে এই স্তরের উপর যে আলো এসে পড়ে তা প্রতিফলিত করে আবার রেটিনার ওপর ফেলে। ফলে রেটিনার গ্রাহক কোশগুলো আবার একবার আলোর অনুভূতি গ্রহণ করে। এইভাবে রেটিনার গ্রাহক কোশগুলো একবার সরাসরি, আরেকবার ওই 'আয়না' থেকে প্রতিফলিত আলোর অনুভূতি গ্রহণ করে। আয়নার মতো এই বিশেষ অঙ্গকে বলা হয় ট্যাপেটাম লুসিডাম (Tapetum Lucidum)। এই স্তর থেকেও আলোর একটা সংকেত মস্তিষ্কে যায়। অর্থাৎ আলোর অনুভূতি গ্রাহক কোশ এবং ট্যাপেটাম লুসিডাম থেকে সংকেত মস্তিষ্কে পৌঁছায়। তারপর মস্তিষ্ক সব তথ্যকে বিশ্লেষণ করে বস্তুর প্রকৃত ছবি তৈরি করে। তখন প্রকৃত বস্তুকে দেখা যায়। ট্যাপেটাম লুসিডামে যে বস্তুটি এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেটি হল ভিটামিন বি-২ বা রাইবোফ্ল্যাভিন।



ট্যাপেটাম লুসিডাম থেকে প্রতিফলিত সমস্ত আলো কিন্তু রেটিনার গ্রাহক কোশের উপর পড়ে না। বেশ কিছুটা আলো তারারন্ধ্র দিয়ে পুনরায় বাইরে বেরিয়ে আসে। আর সেই আলো যখন আমাদের চোখে এসে পৌঁছায় তখন আমরা ওই প্রাণীর দুটো চোখ জ্বলজ্বল করতে দেখি।

এ তো গেল রাত্রিবেলায় দেখার ব্যাপার। আমরা যেমন দিনের বেলায় ভালো দেখি বিড়াল জাতীয় প্রাণীরা কি আমাদের মতো দিনের বেলায় ভালো দেখতে পায়? উত্তর হল, না। ওদের রেটিনাতে কোন কোশ (Cone cell) আছে কম। তার ওপর বেশি সূর্যের আলো চোখের মধ্যে প্রবেশ করলে ট্যাপেটাম লুসিডামে বিপুল প্রতিফলন হবে। আর তাতে দেখার ক্ষেত্রে ভীষণ সমস্যা হবে। তাই এরা একটা দারুণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যখনই দিনের বেলায় উজ্জ্বল আলো ওদের চোখে এসে পড়ে তখন ওদের তারারন্ধ্রকে ওরা অনেকটা ছোটো করে দেয়। ঠিক যেমন ভাবে দু'দিক থেকে স্লাইডিং দরজার দুটো পাল্লা টেনে এনে দরজার ফাঁকটাকে ছোটো করে দেওয়া যায় ঠিক তেমনি দু'পাশ থেকে লম্বালম্বি তারারন্ধ্রের ছিদ্রকে ছোটো করে দেয়। তখন দিনদুপুরেও ওদের চোখে বেশি আলো ঢুকতে পারে না। তবে হ্যাঁ, সমস্যা তো কিছু হয়ই। আমরা দিনে যতটা স্পষ্ট করে দেখতে পাই ওরা দিনে তত স্পষ্ট দেখতে পায় না, কারণ চোখের ভেতরে আলো এত বেশি প্রতিফলিত হয় যে একটা আবছা প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। কিন্তু রাতে স্পষ্ট প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। তাই দিনের বেলায় কোনও বস্তুকে ভালোভাবে দেখতে হলে বিড়াল জাতীয় প্রাণীদেরকে বস্তুর কাছে এগিয়ে যেতে হয়। দিনের বেলায় বিড়াল জাতীয় প্রাণীরা যতদূর থেকে কোনও বস্তুকে স্পষ্ট দেখে আমরা তার সাত গুণ দূরের কোনও বস্তুকে সেভাবেই স্পষ্ট দেখি। কিন্তু রাতে আমাদের চেয়ে ওরা দেখার ব্যাপারে বহুগুণ এগিয়ে। অন্ধকারে বা খুব কম আলোতে ওদের তারারন্ধ্র এতটা বড়ো হয়ে যায় যে অনেকটা পরিমাণ আলো সেখান দিয়ে চোখের ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়। আমাদের তারারন্ধ্রের তুলনায় ওরা তারারন্ধ্রকে ৫০% বেশি প্রসারিত করতে পারে।



অন্যান্য প্রাণীরও কি রাত্রিবেলায় চোখ এমন জ্বলজ্বল করে? হ্যাঁ, ছাগল, ভেড়া, শেয়াল, বাঘ, সিংহ, হরিণ— রাত্রে এদেরও চোখ জ্বলজ্বল

করে। দেখা গেছে, স্থলচর প্রাণীদের ক্ষেত্রে ট্যাপেটাম লুসিডাম স্তরটি চোখের পেছনদিকে প্রায় অর্ধেক অংশ জুড়ে থাকে। এদের ক্ষেত্রে ট্যাপেটাম লুসিডাম থাকে রেটিনার ওপরের দিকে, কারণ এদের খাবারদাবার খুঁজতে হয় মাটির দিকে তাকিয়ে। জলজ প্রাণী ডলফিন, হাঙ্গর ইত্যাদির ক্ষেত্রেও চোখের পেছনদিকে রয়েছে ট্যাপেটাম লুসিডাম। তবে জলজ প্রাণীদের ট্যাপেটাম লুসিডাম থাকে চোখের অনেকটা অংশ জুড়ে, কারণ জলের নিচে অন্ধকারে অনেকটা জায়গা জুড়ে তাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখতে হয়।

এই পড়ে নিশ্চয়ই ভাবছো— ইস, আমাদের চোখেও যদি ট্যাপেটাম লুসিডাম থাকত তাহলে আমাদের চোখও রাতে জ্বলজ্বল করতো! আসলে



ওই যে কথায় আছে না, যা চেয়েছি কেন তা পাই না, যা পেয়েছি কেন তা চাই না! আমাদের চোখের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অধিকাংশ প্রাণীর নেই। যেমন, আমরা খুব নিখুঁতভাবে বস্তুর দূরত্ব, আকার ও রঙ নির্ণয় করতে পারি যেটা খুব কম প্রাণীই পারে। যেসব প্রাণীকে তাদের পেটের জ্বালায় রাতে শিকারের খোঁজে ঘুরতে হয় তাদের ভরসা চাঁদের আলো আর ঝিকিমিকি তারাদের আলো। তাই তাদের চোখে ট্যাপেটাম লুসিডাম না থাকলে ওই মৃদু আলোতে শিকার ধরা মুশকিল। আবার যেসব প্রাণীকে শিকার হতে হয় তাদেরও চোখে ট্যাপেটাম লুসিডাম থাকে যাতে তারা অন্ধকারের মধ্যেও বুঝতে পারে শিকারী প্রাণী তার দিকে এগিয়ে আসছে।

চোখের আলো নিয়ে যখন এতসব কথা বললাম তখন আরও দুটো কথা এর সাথে বলি। প্রথমতঃ খরগোশদের কথা। অনেকেই শুনেছো, খরগোশরা নাকি পেছনদিকেও দেখতে পায়। তাহলে পেছনে কোনও চোখ আছে নাকি? না, তা নেই। কিন্তু ওদের চোখের এমন বৈশিষ্ট্য আছে যার সাহায্যে ওরা প্রায় পুরো পেছন দিক দেখতে পায়। ওদের মাথার খুলির হাড়টা দু'পাশে অনেকটা উঁচু, আর তাতেই রয়েছে বড়ো বড়ো দুটো চোখ। চোখ ~~দুটো মাথার এতটা পাশের~~ দিকে রয়েছে যে এক একটা চোখের সাহায্যে প্রায় ১৪৫ ডিগ্রি অঞ্চল দেখতে পায়। কেবল নাকের সামনে প্রায় ৩০ ডিগ্রি এলাকা থাকে দৃষ্টির বাইরে। অবশ্য তাতে কুছ পরোয়া নেই। ওদের ঘ্রাণশক্তি অতি প্রখর। আর ওদের আমাদের মতো নাক ও মুখ দু'জায়গা দিয়ে শ্বাস নেওয়ার ব্যবস্থা নেই, কেবল নাক দিয়েই নেওয়া যায়। তাই ঘ্রাণ অনুভব করার ক্ষমতা ওদের অনেক বেশি। তাছাড়া নাকের সামনে থাকা লম্বা গোঁফগুলো সামনে কী আছে তা বুঝতে দারুণ সাহায্য করে। খরগোশের চোখে আছে এক ধরনের লেন্স যাকে বলে 'ফিশ আই লেন্স'। এই লেন্স বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে তার দৃষ্টি পরিসীমার মধ্যে আনতে পারে। এই লেন্সটা অন্যান্য প্রাণীর চোখের লেন্সের তুলনায় অনেক বেশি উত্তল। তাই অনেক বেশি অঞ্চলের প্রতিবিম্ব ওদের চোখে ধরা পড়ে। এই কারণে খরগোশকে পেছনদিক থেকে শিকার করা মুশকিল। খরগোশ শিকারির খপ্পর থেকে সহজেই নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারে। ছাত্ররা নিশ্চয়ই ভাবছো স্যারেদের যদি এমন একখানা লেন্স চোখে থাকত পরীক্ষার হলে কী বিপদেই না পড়তে! একটু যে পেছনে ঘুরবে বা এদিক ওদিক ঘাড় ঘোরাবে সে সুযোগ পাওয়া যেত না!

এবার দ্বিতীয় কথায় আসি। যাদের চোখে ট্যাপেটাম লুসিডাম আছে তাদের চোখে ওই প্রতিফলকটি থেকে আলোর প্রতিফলন ঘটে— এ কথা তোমরা এতক্ষণে জেনেই গেছো। তাই অন্ধকারে নিশাচর প্রাণীদের চোখ জ্বলে। আর আমাদের চোখে ট্যাপেটাম লুসিডাম নেই তাই অন্ধকারে



আমাদের চোখ জ্বলে না। কিন্তু একটুও কি আলো আমাদের চোখের ভেতর থেকে প্রতিফলিত হয় না? হয়, যদি খুব তীব্র আলো এক ঝটকায় তারারন্ধ্র দিয়ে চোখের ভেতরে ঢুকে যায়। তখন রেটিনা থেকে বেশ কিছুটা আলো প্রতিফলিত হয়ে তারারন্ধ্রের মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। কী করে বুঝবে? রক্তচক্ষু দেখেছো? না, রেগে যাওয়া চোখের কথা বলছি না। ক্যামেরার উজ্জল ফ্ল্যাশ দিয়ে যদি ছবি তোলা হয় তখন অনেক সময় দেখা যায় আমাদের চোখের ম ঝখানে লাল রঙের দাগ। এ রক্ত চক্ষু নয়তো কী? আসলে উজ্জ্বল আলোর ফ্ল্যাশ যখন চোখে পড়ে তখন এত দ্রুত আলো চোখের উপর এসে পড়ে যে তারারন্ধ্র যথেষ্ট সংকুচিত হয়ে সেই আলো কম পরিমাণে প্রবেশ করাতে পারে না। ফলে অনেকটা আলো তারারন্ধ্র দিয়ে রেটিনার উপরে এসে পড়ে। তখন রেটিনা থেকে প্রতিফলিত আলো বিপরীত পথে বেরিয়ে এসে ক্যামেরার লেন্সে এসে পড়ে। রেটিনা রক্তজালক পূর্ণ হওয়ায় তার রঙ লাল। তাই ক্যামেরায় রেটিনার ওই অংশটুকু লাল দেখায়। এবার বুঝলে তো, ক্যামেরাও কিন্তু রক্তচক্ষু দেখাতে পারে!

লেখক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

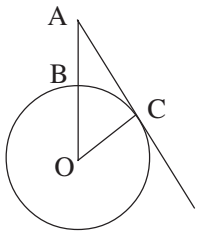
email: janasoumyakanti@gmail.com • M. 9064202882

অংক

ড. গোপাল কৃষ্ণ গাঙ্গুলি

দিগন্ত দর্শন

মানুষের চিরদিনই দূর থেকে পৃথিবীকে দেখার আকাঙ্ক্ষা ছিল কিন্তু সুযোগ ছিল না। কিছুটা সুযোগ মিলল বিমান বা বেলুন আবিষ্কারের পর। তার আগে পাহাড়ের মাথা থেকে নদী বা শহর দেখা যেত তবে বিমান থেকে যে দূরত্ব দেখা যায় তার তুলনায় সেটা অনেকটাই কম। নিজের জীবনে প্রথম বিমান যাত্রায় একসাথে অনেক নদী, গোটা শহর দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছিল এবং বেশ ভাল লেগেছিল, পাশাপাশি ভাবার চেষ্টা করেছিলাম কতটা দূরত্ব দেখ গেল, সেই ভাবনা থেকেই এই লেখা। আমরা কোন সমভূমিতে খালিচোখে প্রায় 4 কিমি দূরত্বে দিগন্ত দেখি তাকেও এই লেখায় বিশ্লেষণ করা হবে।



উপরের চিত্রতে যে বৃত্তটি দেখা যাচ্ছে সেটা পৃথিবীর একটি Cross section (প্রস্থচ্ছেদ) এবং এই তলে দর্শক ও তার থেকে সর্বাধিক দূরে দৃশ্যমান পৃথিবীর একটি বিন্দুকে দেখান হয়েছে। নাম দিয়ে বললে A উচ্চস্থানে অবস্থানরত দর্শক, O পৃথিবীর কেন্দ্র, B বৃত্তটির সঙ্গে $\overline{AO}$ সরলরেখার ছেদবিন্দু। সোজা কথায় A থেকে উলম্ব ভাবে নামলে পৃথিবীর একটি বিন্দু, C, A থেকে দৃশ্যমান পৃথিবীর সর্বাধিক দূরত্বে অবস্থিত বিন্দুগুলির একটি। ধরে নেওয়া যাক AB<<OA (অর্থাৎ AB, OA এর তুলনায় খুবই ছোট)। ধরি AB = h একক, OB = R একক এবং AC = d একক।

পীথাগোরাসের সূত্র অনুযায়ী $AC^2+OC^2 = AO^2$

[OC, AC এর উপর লম্ব কারণ AC স্পর্শক এবং OC স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধ]

$$d^2+R^2 = (R+h)^2$$

$$d^2 = 2hR+h^2$$

যেহেতু $h<<r$ সুতরাং $h^2<<2hr$

এক্ষেত্রে h^2-কে উপেক্ষা করলে

$$d^2 = 2hR$$

বিকল্প পদ্ধতি

$$h^2+2hR-d^2 = 0$$

$$h = \frac{-2R+\sqrt{4R^2+4d^2}}{2}$$

[ঋনাত্মক চিহ্ন নেবে যেহেতু h>o]

$$= -R+\sqrt{R^2+d^2}$$

$$= -R+R\left(1+{d^2}/{R^2}\right)^{1/2}$$

$$= -R+R\left\{1+\tfrac{1}{2}\frac{d^2}{R^2}+\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)}{\lfloor 2}\left(\frac{d^2}{R^2}\right)\right.$$

$$= -R+R+\frac{d^2}{2R} \qquad \left[{d}/{R} \text{ খুব ছোট বলে } \frac{d^2}{R^2}\right.$$

$$\therefore d^2 = 2hR \qquad \text{এবং তাঁর higher order}$$

$$\therefore d = \sqrt{2hR} \qquad \text{উপেক্ষা করা হল]}$$

যেহেতু পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6400 কিমি।

$\therefore R = 6400$

10 কিমি উচ্চতার বিমান থেকে পর্যবেক্ষণ করলে h= 10

$$\therefore d = \sqrt{2\times10\times6400} = 160\sqrt{5}$$

$$= 357$$

অর্থাৎ AC = 357 কিমি প্রায়।

কোনো ব্যক্তি যদি 5 ফুট উচ্চতা হন তার পা এর পাতা থেকে চোখের দূরত্ব 5 ফুটের কম। যদি ভূমি থেকে চোখের দূরত্ব 5 ফুট ধরে নেওয়া হয়। তবে সেক্ষেত্রে দিগন্তের দূরত্ব

$$= \sqrt{2hR} \because \text{ কিমি}$$

$$= \sqrt{2\times\frac{5\times30.48}{100000}\times6400} \text{ কিমি} \qquad [5 \text{ ফুট}$$

$$= 4.41 \text{ কিমি} \qquad = \frac{5\times30.48}{100000} \text{ কিমি}]$$

ধরি $\angle BOC = \theta$ রেডিয়ান

$AC = OA\sin\theta = (R+h)\sin\theta \cong R\sin\theta$

Arc $BC = R\theta$ $[\because h<<R]$

$$\frac{AC}{\overset{\frown}{BC}} = \frac{\sin\theta}{\theta}$$

আমরা জানি $\theta \to O$ হলে $\frac{\sin\theta}{\theta} = 1$

তাই যেহেতু AC = d ব্যাসার্ধ R এর তুলনায় যথেষ্ট ছোট তাই θও খুব ছোট।

$$\therefore AC \cong \overset{\frown}{BC}$$

এবার আবার আগের আলোচনায় ফেরা যাক দৃশ্যমান দিগন্তকে (যদিও সমতল নয়), সমতল ধরে নিলে বিমান থেকে যে অঞ্চলটি দেখা যায় তার যে ক্ষেত্রফল $\Pi\ (357)^2$ বর্গকিমি = 400392 বর্গকিমি যা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষেত্রফলে প্রায় সাড়ে চার গুণ।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। আর 400 কিমি উচ্চতার Satellite থেকে দৃশ্যমান দিগন্ত প্রায় 2200 কিমি যা দেশ ছাড়িয়ে মহাদেশ, ভাবলেও রোমাঞ্চ হয়।

লেখক বিজ্ঞানের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, বিজ্ঞান প্রচারক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

M. 7980726276

প্রবীর বসু

ভয়ঙ্কর সমস্যা গ্লোবাল ডিমিং



বর্তমান পৃথিবীতে যে কতকগুলি ভয়ঙ্কর পরিবেশ সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম গ্লোবাল ওয়ার্মিং— একথা কমবেশি সকলেরই জানা। কিন্তু এর আড়ালে সবার অলক্ষ্যে আরেকটি ভয়ঙ্কর পরিবেশ সমস্যা যা পৃথিবীকে গ্রাস করতে চলেছে তা হল "গ্লোবাল ডিমিং"। এই শব্দবন্ধটি কিন্তু অনেকের কাছেই নতুন। তাই এ সম্পর্কে কিছু জানার প্রয়োজন। 'ডিমিং' শব্দটি এসেছে ইংরেজি 'Dim' শব্দ থেকে। ডিম যার বাংলা অর্থ লীন বা মৃদু। তাই গ্লোবাল ডিমিং-এর বাংলা আমরা বিশ্ব ক্ষীনায়ণ নামে অভিহিত করতে পারি। আসলে পৃথিবীপৃষ্ঠে সূর্যের আলো বা রশ্মি ধীরে ধীরে লীন হয়ে আসছে। অর্থাৎ সূর্যের আলো যতটা আমাদের পৃথিবীতে আসার কথা ছিল বা আছে আসত, বর্তমানে সমপরিমাণ আলো পৃথিবীপৃষ্ঠে পৌঁছাচ্ছে না বা পৌঁছতে পারছে না। সূর্য থেকে নির্গত রশ্মি বায়ুমন্ডলে কিছুটা প্রবেশ করেই প্রতিফলিত হয়ে যাচ্ছে মহাবিশ্বের দিকে, পৃথিবীতে আসার আগেই। কিন্তু কেন এই ফিরে যাওয়া? কারণটা কি?

মার্কিন, ব্রিটিশ এবং অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষা চালিয়ে যে উত্তরটি পেয়েছেন তা হল, এর পিছনে রয়েছে পরিবেশ দূষণ। আরও নির্দিষ্ট করে বললে বায়ুদূষণ। আর এর প্রভাবেই বায়ুমন্ডল ক্রমশঃ অস্বচ্ছ হয়ে আসছে, একটা মেঘের আস্তরণ যেন ঢেকে রাখছে সমগ্র বায়ুমন্ডলকে, যার ফলে সূর্যরশ্মি পৃথিবীতে আসতে বাধা পাচ্ছে। কি পরিমাণ আলো আসবার কথা তা আসছে না। আর স্বাভাবিকভাবেই কম পরিমাণে আলো পৌঁছানোর জন্য পৃথিবীর উষ্ণতা আলোকিত ধর্মের সঙ্গে যুক্ত ঘটনাবলিও কমছে। আর একেই বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন "গ্লোবাল ডিমিং"।

তাহলে কি হবে? পৃথিবীতে সূর্যের আলো যদি কমে যায় তাহলে এত প্রাণ যারা সূর্যরশ্মির উপর একান্তই নির্ভরশীল। তাদের কি হবে? কি হবে উদ্ভিদের আলোক-সংশ্লেষের? সমস্ত প্রাণ কি তাহলে নিষ্প্রাণ হয়ে যাবে? কাজেই "গ্লোবাল ডিমিং" এখন আমাদের সামনে এক বড় চ্যালেঞ্জ। আবার "গ্লোবাল ওয়ার্মিং" এবং "গ্লোবাল ডিমিং" এই দুই বিপরীত ধর্মী পদ্ধতির প্রভাবে পৃথিবীর বিজ্ঞানী এবং আবহাওয়াবিদ মহল পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ুর ক্ষেত্রে ব্যাপক চরিত্রগত পরিবর্তনের আশঙ্কা করছেন। এমনকি আমাদের এশিয়া মহাদেশের ক্ষেত্রেও পড়তে পারে ভয়ঙ্কর প্রভাব। বদলে যেতে পারে বর্ষার গতিপ্রকৃতি। যদি বিগত ২০-২৫ বছরের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে খুব ধীরে ধীরে হলেও বদলে যাচ্ছে বর্ষার সময়। বদলে যাচ্ছে মোট বৃষ্টিপাতের সময়। বিজ্ঞানীমহলের মত এর প্রধান কারণ পরিবেশ দূষণ। আরও নির্দিষ্ট করে বললে গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন। আসলে কাঠ, কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ার ফলে বাতাসে মিশছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, সালফার-ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি। সূর্যরশ্মি ঐ কণাগুলির সংস্পর্শে আসার পরই প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে না এসে ফিরে যায় মহাকাশে।

সূর্যবিকরিত রশ্মি পৃথিবীতে না এসে যে প্রতিফলিত হয়ে মহাদেশে ফিরে যাচ্ছে তা প্রথম খেয়াল করেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জেরি স্ট্যানহিল। স্ট্যানহিল বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখেন সোভিয়েত ইউনিয়নে ৩০ শতাংশ, গ্রেট ব্রিটেনে ১৬ শতাংশ এবং আমেরিকায় ১০ শতাংশ আলো পৌঁছনোর পরিমাণ কমে গিয়েছে। তিনি এই গবেষণাটি ২০০১ সালে প্রথম প্রকাশ করেন এবং নাম দেন গ্লোবাল ডিমিং অথচ এ বিষয়ে বিশেষভাবে কোন প্রচার সেভাবে লক্ষ্য করা যায়নি।

অথচ সত্যিই যদি এভাবে সূর্যের আলো পৃথিবীতে না এসে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায় মহাকাশে এবং ক্রমাগত এর হার বাড়তে থাকে তাহলে তার প্রভাব পড়বে বৃষ্টিপাতের উপর। সমুদ্রে বা জলরাশিতে সূর্যরশ্মি যত কম পড়বে ততই কমবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। আবার অপরদিকে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ব্যাহত হলে খাদ্য উৎপাদন ও জীবনধারণে এক গভীর সঙ্কট উপস্থিত হবে।

পরিবেশ বিজ্ঞানীদের ধারণা সত্তর-আশির দশকে আফ্রিকায় যে ভয়াবহ ক্ষরা হয়েছিল তার প্রধান কারণ ছিল এই "গ্লোবাল ডিমিং"। আবার এশিয়ার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। এই আশঙ্কা করছেন ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার আবহাওয়া বিজ্ঞানী বীরভদ্র রঙ্গনাথন। তার মতে গোটা পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেকই এশিয়ায় হওয়ায় সেখানে জ্বালানির ব্যবহার অনেক বেশি। ফলে বাতাসে বাড়ছে কার্বন ও গন্ধক কণা। সূর্যের আলো আরও কমবে। তাতে কমে যেতে পারে গোটা এশিয়ার বৃষ্টিপাত।

কাজেই প্রয়োজন অবিলম্বে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার। গ্রিন হাউস গ্যাস কমবার জন্য চাই সঠিক পরিবেশ নীতি কিম্বা আইন, জীবাশ্ম জ্বালানির সঠিক বিকল্প, তেমনি চাই যথার্থ মাত্রায় পরিবেশ সচেতনতা। একমাত্র সেক্ষেত্রেই বাঁচব আমরা, বাঁচবে আমাদের পৃথিবী।

লেখক জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশকর্মী ও ভ্রমণ বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদক

email: prabirchandrabasu54@gmail.com • M. 9830676330

ড. সৌমিত্র চৌধুরী

স্বর্ণলতা

বেড়াতে গিয়ে চোখে পড়ল বিশেষ রকম এক গাছ। গ্রামের দিকে গেলেই আগে দেখতে পেতাম। আজকাল দেখা যায় কম।



দেখলাম গাছটা, বর্ধমানের গ্রামে। তবে যে কোনো গাঁয়ের পথে হাঁটলেই দেখা মেলে। বলছি সেই গাছের কথা। গাছটা পরজীবী। মানে অন্য গাছের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। অবশ্য মূল কান্ড পাতা দিয়ে তৈরি গাছ নয়, শুধু মাত্র লতা। বাঁচে মাত্র এক বছর। তাই বলা হয় একবর্ষজীবী। উদ্ভিদের পাতা নেই। শিকড় নেই। শুধুই লতা। এই লতা, 'স্বর্ণলতা'। সোনালী সুতোর মত দেখতে। কেউ বলেন 'অলোকলতা', অনেকে বলেন 'শূণ্যলতা'। ইংরাজিতে গোল্ড ভাইন (Gold vine), কেউ বলেন ডডলার প্ল্যান্ট (Doodler plant)। বৈজ্ঞানিক নাম কাসকিউটা রিফ্লেক্সা (Cuscuta Reflexa)। কাসকিউটা (Cuscuta) এর গণ। এই গণের উদ্ভিদ অনেক ধরণের। বহু প্রজাতি এদের প্রায় ১৭০ রকম।

অনেক কবি লিখেছেন আমাদের গ্রাম বাংলার এই গাছ নিয়ে। মাইকেল মধুসূদন দত্তও লিখেছেন কবিতা। অতি বিখাত সেই কবিতা, 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা'।

নিজের ক্ষমতায় বাঁচতে পারে না স্বর্ণলতিকা। কেন পারে না? স্বর্ণলতিকার শরীরে ক্লোরোফিল থাকে না। ক্লোরোফিলের সাহায্য নিয়েই গাছ তৈরি করে নিজের খাবার, গ্লুকোজ। গ্লুকোজ তৈরির কাজে সাহায্য করে বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড, গাছের শিকড় থেকে টেনে নেওয়া জল আর সূর্যের আলো। খাদ্য তৈরির এই প্রক্রিয়ার নাম সালোকসংশ্লেষ।

কিন্তু পরজীবী গাছ স্বর্ণলতিকার নেই সালোকসংশ্লেষ করবার ক্ষমতা। অন্য গাছের মত নিজের খাবার তৈরি করে নিতে পারে না। ক্লোরোফিল থাকে না, তাই পারে না। আবার মাটি থেকে কোনো খাদ্য উপাদান জোগাড় করবে, তেমন ক্ষমতাও নেই। শিকড় নেই তো এদের শরীরে! পোকা মাকড় ধরে খাবে, তেমন কৌশলও জানা নেই। তাহলে কোন কৌশলে বেঁচে থাকবে?

বেঁচে থাকে অন্য গাছের শরীর থেকে খাবার শুষে নিয়ে। অপরের শরীরের খাদ্য উপাদান টেনে নিয়ে বাঁচে। তাই এরা পরজীবী। ইংরাজিতে প্যারাসাইট। পরজীবী গাছ অন্য বড় গাছের কান্ড জড়িয়ে ধরে। বড় বৃক্ষকে বলি পোষক উদ্ভিদ (Host)। পোষকের শরীর জাপটে ধরে পরজীবী। পরজীবীর শিকড় নেই তবে আছে শিকড়ের মত এক অঙ্গ, 'হস্টোরিয়া'। হস্টোরিয়া (Hausteria) দিয়ে পেষকের শরীরের রস টেনে নেয়। সেই খাদ্যরস খেয়ে প্রাণ বাঁচায়।

খুব হাল্কা ভাবে পোষকের শরীরে লেগে থাকে না কিন্তু। একেবারে পোষকের কাণ্ডের অনেক ভিতরে জাইলেম আর ফ্লোয়েমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জল, খাদ্য টেনে নেয়। এভাবেই নিজের চাহিদা মিটিয়ে বেঁচে থাকে স্বর্ণলতিকা।

এ গাছের জন্ম হয় কীভাবে? যে কোনো গাছে কি হতে পারে? পাখিতে কি কিছু এনে এর জন্মে সহায়তা করে?

এমন বহু প্রশ্ন মানুষের মনে। প্রথমেই বলি, ছোট বড় যে কোনো গাছে জন্মাতে পারে। অনেক গাছের মধ্যেও নিজের উপযুক্ত পোষক খুঁজে নেয় স্বর্ণলতা। কিছু উদ্বায়ী রাসায়নিক বের হয় পোষকের পাতা কান্ড থেকে। সেগুলোকে সনাক্ত করে নিজের উপযুক্ত পোষক বেছে নেয় স্বর্ণলতা।

তবে জীবনীশক্তি কম, তাই প্রবল ঠাণ্ডা কিংবা তীব্র গরমে বাঁচতে পারে না। স্বর্ণলতার ফুল হয়। সাদা কিংবা গোলাপি রঙের। ফুলের মধ্যে থাকে বীজ। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এমন লতার পরিচয় প্যারাসাইটিক অ্যাঞ্জিওস্পার্ম (Parasitic angiosperm)। এর জন্ম হয় বীজ থেকে। বীজ মাটির মধ্যে পড়ে বেঁচে থাকতে পারে অনেক দিন। তারপর উপযুক্ত পোষক খুঁজে নিয়ে তার গায়ে আশ্রয় নেয়। আবার লতার ছোট অংশ থেকেও জন্মাতে পারে। বর্ষার জলে কিম্বা হাওয়ায় ভেসে স্বর্ণলতার ছোট টুকরো চলে যায় দূরের কোনো গাছের পাতায়, কান্ডে। পাখির ঠোঁটে কিংবা পায়ের নখে লেগে পৌঁছে যেতে পারে বৃক্ষ চূড়ায়। কোনো বন্ধু স্বর্ণলতা কিছুটা ছিঁড়ে এনে বর্ষাকালে জড়িয়ে দিতে পারেন তাঁর বাগানের কোনো বৃক্ষে কিংবা বেড়ার ছোট গাছে। এভাবেই প্রকৃতিতে টিঁকে থাকে সোনালী স্বর্ণলতা।

বিস্ময়কর এই গাছ। অসংখ্য রাসায়নিক উপাদানে ঠাসা। কয়েকটির নামঃ ফ্ল্যাভোনয়েড, ম্যানিটল, লাইকোপিন, পামিটিক অ্যাসিড, কুয়ারসেটিন, স্টিয়ারিক অ্যাসিড। বহু রোগের দাওয়াই হিসাবে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে প্রয়োগ হয় ফুল, বীজ, ডাল। জীবাণু নাশক এই লতা। লেখা আছে বহু রোগে এর প্রয়োগ বিধি। বাত, চোখের রোগ, পেটের ব্যাধি। হজম শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার হয়। জণ্ডিস রোগ সারিয়ে তুলতেও প্রয়োগ করা হয়। বিস্তারিত জানানো সম্ভব নয়। তবে গবেষণা চলছে আমাদের দেশের এই লতা নিয়ে। কেউ বিশদে জানতে চাইলে পড়ে নেবেন কিছু গবেষণা প্রবন্ধ (A parasitic Medicinal plant Cuscuta reflex an Overview by Pooja Saini International journal of Scientific and Engineering Research 6–12 December, 2015, 951-960)।

গ্রামের পথে হাঁটতে হাঁটতে মোবাইল ক্যামেরায় স্বর্ণলতার ছবিটা তুলে রেখেছি।

লেখক ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান ও এমেরিটাস মেডিক্যাল স্যায়েন্টিস্ট, চিত্তরঞ্জন জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা সংস্থা, কলকাতা ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: soumitrag10@gmail.com • M. 9831046252

জি ৎ ম ণ্ড ল

বাঁশ গাছ নিয়ে কিছু কথা



বাঁশের বিজ্ঞানসম্মত নাম হল : Bambusa SP. (যেমন, *Bambusa tabula, Bambusa vulgaris*)

বাঁশ হলো একটি কাষ্ঠল চিরহরিৎ উদ্ভিদ। এটিকে আমরা সবাই গাছ বলে থাকলেও এটি আসলে একটি ঘাস পরিবারের সদস্য। বাঁশ হল পৃথিবীর ঘাস পরিবারে বৃহত্তর সদস্যদের একটি। বাঁশ বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল উদ্ভিদ। এটি ২৪ ঘন্টায় ৪৭.৬ ইঞ্চি বৃদ্ধিতে রেকর্ড করা হয়েছে। কিছু প্রজাতি অনুকূল পরিস্থিতিতে প্রতিদিন এক মিটারেরও বেশি বৃদ্ধি হতে পারে। একটি নতুন বাঁশের অঙ্কুর এক বছরেরও কম সময়ে তার পূর্ণ উচ্চতায় পৌঁছে। এবং এটি একসঙ্গে গুচ্ছ হিসেবে জন্মায় এই বাঁশ গাছ প্রধানত ৫০ থেকে ১০০ বছরের বেশি দিন জীবিত থাকতে পারে।

এছাড়া এই উদ্ভিদটি মানব জীবনের দৈনন্দিন কাজে বিপুল হারে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, তাই বাঁশ গাছ নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিম্নে আলোচনা করা হলো :—

চিকিৎসা ক্ষেত্রে : *Bambusa arundiaeca* নামক বাঁশ গাছ থেকে ANTI INFLAMMATORY ও ANTI ULCER নামক ঔষধ পাওয়া যায় যেখানে ANTI INFLAMMATORY ব্যথা বেদনা উপশম করতে এবং প্রদাহ কমাতে ব্যবহার করা হয়। অপরদিকে ANTI ULCER অ্যাসিড পেপটিক রোগের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়াও আয়ুর্বেদে বাঁশের অনেক ব্যবহার হয়ে থাকে যেমন সর্দি কাশি, ব্যথা বেদনা উপশমের জন্য।

২. অক্সিজেন রিলিজ : বাঁশের একটি গ্রোভ অন্য যে কোনো গাছের তুলনায় ৩৫% বেশি অক্সিজেন নির্গত করে।

৩. কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ : বাঁশ প্রতি বছর হেক্টর প্রতি ১৭ টন হারে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে। এটি একটি মূল্যবান কার্বন সিঙ্ক হিসাবে কাজ করতে পারে।

৪. খরা প্রতিরোধ : বাঁশ খরা-সহনশীল উদ্ভিদ। তারা মরুভূমিতে বেড়ে উঠতে পারে।

৫. মাটির স্থিতিশীলতা : বাঁশের ভূগর্ভস্থ শিকড় এবং রাইজোমের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক রয়েছে যা মাটির ক্ষয় রোধ করে।

৬. প্রাকৃতিক এয়ার কন্ডিশনার : গ্রীষ্মে বাঁশ তার চারপাশের বাতাসকে ৮ ডিগ্রি পর্যন্ত ঠান্ডা করে।

৭. সারের প্রয়োজন নেই : বাঁশের বৃদ্ধির জন্য সারের প্রয়োজন হয় না। এটি তার পাতা ফেলে দিয়ে স্ব-মালচিং করতে পারে এবং বৃদ্ধির জন্য পুষ্টি ব্যবহার করতে পারে।

৮. নির্মাণ সামগ্রী : বাঁশ অবিশ্বাস্যভাবে শক্তিশালী এবং বলিষ্ঠ। এটি কংক্রিটের ভাড়া, সেতু এবং ঘরবাড়ির কাঠামো হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৯. কাঠ প্রতিস্থাপন : বেশিরভাগ নরম কাঠের গাছের ২০-৩০ বছরের তুলনায় বাঁশ ২-৩ বছরে কাটা যায়।

১০. বাঁশবন সারা পৃথিবী জুড়ে কমবেশি ৫০টি পাখির আবাসস্থল।

১১. ভারতবর্ষের National building code-এ বাঁশের স্ট্রাকচার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সম্ভবত ২০০৫ সালে।

১২. সুবিখ্যাত ফরাসী আর্কিটেক্ট লরেন্ট ফোর্নিয়ের, বাংলার জামাই, যিনি প্রায় দু-দশক ধরে কলকাতায় থাকেন, সারা বিশ্ব জুড়ে বাঁশের বাড়ি তৈরি করেন। ওনার তৈরি বাঁশের বাড়ি আয়লা ঝড়কে সামলেছে। অথচ অনেক কম খরচে তৈরি হয়। ওনার সঙ্গে কাজ করেন স্বনামধন্য বাঙালি আর্কিটেক্ট পুলহ দাশগুপ্ত। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক ইন্দো-জার্মান দম্পতির নামকরা বাঁশের দোতলা বাড়িটি ওদেরই বানানো।

লেখক স্নাতক স্তরের (বিজ্ঞান) ছাত্র ও পরিবেশকর্মী ও সদস্য জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব (JSNC) *M. 7029110672*

সংবাদ

ইমিউনোলজিকে জনপ্রিয় করার আহ্বান চিকিৎসকদের



শিশুদের ও বয়স্ক প্রবীণদের ইমিউনিটি কম কেন? এই নিয়ে ২৯ এপ্রিল আলোচনা হল আন্তর্জাতিক ইমিউনোলজি দিবসের সেমিনারে। সেমিনারের মূল বক্তা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. কুণাল সরকার বলেন, টিকা ছাড়াও এখন ইমিউনোলজি জনস্বাস্থ্যে ভীষণ উপকারে আসছে। 'কার-টি সেল থেরাপী' ক্যানসার চিকিৎসায় যেমন সাড়া ফেলে দিয়েছে, জেনোজেনিক ট্রান্সপ্লানটেশন আগামীর ভবিষ্যত বলে মনে করা হচ্ছে। এবারের থীম— 'বয়োঃবৃদ্ধি ও ইমিউনিটি' নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন ইমিউনোলজী বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সিদ্ধার্থ জোয়ারদার। তিনি বলেন, বিশেষ খাবার খেয়ে কারও নিজস্ব ইমিউনিটি বাড়ানো যায় না। এটা তার জেনেটিক মেক-আপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রাজ্যের প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলগাছিয়া ক্যাম্পাসে সভাটি যৌথভাবে আয়োজিত হয় পিপলস অ্যাসোসিয়েশন অফ সায়েন্স এন্ড এনভায়রনমেন্ট (পেস) ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিট-এর উদ্যোগে। সহায়তায় ছিল ইন্ডিয়ান ইমিউনোলজি সোসাইটি। সভার শুরুতে আলোচনার সূত্রটি বেঁধে দেন পেস এর সচিব অধ্যাপক প্রদীপ কুমার দাস। দিনটি পালনের গুরুত্ব তুলে ধরেন পেস-এর সভাপতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অশোক কান্তি সান্যাল। সেমিনারটি উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শ্যামসুন্দর দানা। সেমিনার ছাড়াও পড়ুয়াদের জন্য তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

রিপোর্ট

অসীম বসাক

কি খাচ্ছি? মশলা না বিষ?

খাবারকে সুস্বাদু সৌরভময় ও রং চঙে আকর্ষণীয় করতে আমরা বিভিন্ন মশলা ব্যবহার করি। খাবারে লবণ ও মিষ্টি যেমন চিনি বা গুড়ের ব্যবহার কমাতেও মশলা ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন গাছের পাতা ফুল ফল বীজ কাণ্ড শিকড় ও ছাল মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন তেজ পাতা জাফরান লঙ্কা জিরা আদা হলুদ দারচিনি। এগুলিতে বিভিন্ন ফাইটোকেমিক্যাল থাকে যা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ও অ্যান্টিভাইরাল রূপে কাজ করে। তাই বিভিন্ন খাদ্য বস্তুকে অণুজীবের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে তথা পচন রোধ ও বিষক্রিয়া বন্ধ করতে মশলা ব্যবহার করা হয়। অল্পকথায় বিভিন্ন মশলা বিভিন্ন খাদ্যকে সংরক্ষণ করে ও খাদ্যে পুষ্টির ভারসাম্য রক্ষা করে।

আর সেই মশলায় কিনা বিষ?
চাষে বাসে কি ঝামেলা! কেন? আগাছা, পোকা মাকড় ছত্রাক পরজীবী কত কি।
ব্যবসায়ী মানুষ সহজে প্রচুর মুনাফা চায়।
তাই চাষে বাসে কি ঝমেলা! আগাছা ক্ষেতের আসে পাশে।
লোকজন লাগে না, দাও ছিটিয়ে। ঝলসে নিকেশ হয় এক নিমেষে।
জলে মেশে, সাপ ব্যাঙ মাছ মরে, পোকা মরে, মরে পাখি; শস্যে সব্জিতে মেশে।
বিষ আসে পাতে পাতে প্রতি ঘরে ঘরে।
এইচ ফর হার্বিসাইড আগাছানাশকারী।
ব্যবহার বন্ধ হোক। চাষের কাজে মানুষই খুব দরকারি।
ঘরে ঘরে রসায়ন এতো নয় ভুল।
আই ফর ইনসেক্টিসাইড কীটনাশক চোখে সরষে ফুল।
উপকারী পোকা মারে গাছ খেকো পোকাদের।
বাছাবাছি নেই কোনও মানুষ মারে সবেদের। পরিবেশ ছারখার, বিষ ঘরে ঘরে।
হও বিষহরি ইনসেক্টিসাইড ছেড়ে।

আমরা চাষে বাসে বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগ আগাছানাশক কীটনাশক ছত্রাকনাশক হিসাবে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করছি। মশলা চাষেও এর ব্যতিক্রম নেই। এমনকি গোটা ও গুড়ো মশলা সংরক্ষণ করতেও বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগ আকছার ব্যবহার করা হচ্ছে।

জিরা, ধনিয়া, মৌরি, মেথি, সরষে, কালো জিরে, জোয়ান, রাধুনি, গোলমরিচ, লবঙ্গ, দারচিনি, তেজপাতা, এলাচ, জাফরান, জয়িত্রী, জায়ফল এমনকি হলুদ আদা রসুন পেয়াজ লঙ্কা আরও অনেক মশলা তথা মশলা সব্জি চাষে বহুল পরিমাণে আগাছানাশক কীটনাশক ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। এগুলি প্রতিটিই অত্যন্ত ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্য। মানুষ ও পরিবেশ উভয়েরই ক্ষতি করছে।

সব মশলা গাছই এফিড, মাইট, শুঁয়োপোকা, শিকড় পচনকারি কীটপতঙ্গের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ঐসব আটকানোর জন্য চাষে প্রচুর রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে কয়েকটির নাম বলছি :

আগাছানাশক গ্লাইফোসেট এবং অ্যাট্রাজিন ব্যবহার করা হয়। ছত্রাকের সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য থায়াবেনডাজল ও ম্যানকোজেব ব্যবহার করা হয়। কীটনাশক হিসাবে অর্গানোফসফেট যৌগ ক্লোরপাইরিফস ও ম্যালাথিয়ন, পাইরেথ্রয়েড যৌগ যেমন সাইপারমেথ্রিন, ডেল্টামেথ্রিন ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

এই যৌগগুলির কিছু কিছু পাতা ফুল ফল কাণ্ড ছাল কন্দ মূলে থাকে। কাজেই ঐ মশলা খাদ্যে ব্যবহারের ফলে একটু একটু করে বিষ আমাদের শরীরে ঢুকছে। অজান্তে আমরা রোজ বিষ খাচ্ছি আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে!

অক্সিজেনের সংস্পর্শে মশলার রঙ ও গন্ধ নষ্ট হয়। তাই মশলাকে দীর্ঘদিন রাখতে মানে শেলফ লাইফ বাড়াতে একে বায়ু, তাপ, আলো ও আর্দ্রতা থেকে রক্ষা করতে হয়। এর সাথে কিছু রাসায়নিক দ্রব্যও ব্যবহার করা হয়।

এর ওপর আবার মশলাকে আকর্ষণীয় করতে কৃত্রিম রং মেশানো হয়। যেমন শুকনো হলুদ লেড ক্রোমেট দিয়ে রং করা হয় ও গুড়ো হলুদে মেটানিল ইয়েলো মেশানো হয়। লঙ্কা গুড়োতে কৃত্রিম লাল রং যেমন— সুদান লাল-১ মেশানো হয়। এর রাসায়নিক নাম 1-(ফেনাইলডায়াজেনাইল) ন্যাপথালেন-2-অল। এটি একটি অ্যাজো রঞ্জক বা ডাই। হাইড্রোকার্বন দ্রাবক, তেল, চর্বি, মোম, জুতা ও মেঝে রঙ করতে ব্যবহৃত হয়। ওগুলি সবই অবশ্যই ক্যান্সারজনক। কি সাঙ্ঘাতিক! সেগুলি কিনা ব্যবহৃত হচ্ছে খাবারে! বাবারে!

বিষের শেষ নেই। গুড়ো মশলাকে ঝর ঝরে আর ডেলাহীন রাখতে মেশানো হয় বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিকেকিং এজেন্ট। এর মধ্যে আইএনএস ৫৫১ বা সাদা মিহি বালি ও আইএনএস ৫৩৬ বা পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড সব থেকে বেশি ব্যবহার করা হয়। শরীরের পক্ষে অবশ্যই ক্ষতিকারক।

আজকাল বিভিন্ন মশলা বীজ ও মশলা সব্জি যেমন সরষে পেয়াজ আদা রসুন পেস্ট রূপেও পাওয়া যায়। এগুলিতে প্রচুর কৃত্রিম রং আর প্রিজারভেটিভ মানে কেমিক্যালস থাকে। খালি বিষ আর বিষ।

এখানেই শেষ নয়।

পি (P) ফর পেস্টিসাইড।

বিভিন্ন ধরনের মশলা যেমন, জিরা, ধনিয়া, লঙ্কা কে রক্ষা করতে একাধিক কীটনাশক ব্যবহৃত হয়। এতদিন ঐ কীটনাশক মেশানোর সর্বোচ্চ সীমা (MRL) ছিল প্রতি কিলোগ্রামে 0.01 মিলিগ্রাম। ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই) সেটা বাড়িয়ে 0.1 mg/kg করলো। কি চমৎকার!

দরকার ছিল কীটনাশক হীন, আগাছানাশক হীন, ছত্রাকনাশক বর্জিত মশলা। সেখানে বিষের পরিমাণ বাড়িয়ে দিল! ছিঃ!

হংকং, সিঙ্গাপুর, মালদ্বীপ এবং নেপাল MDH এবং এভারেস্ট ব্র্যান্ডের মশলায় যথেষ্ট বেশি মাত্রায় কীটনাশক পাওয়ায় ঐসব দেশে ঐ মশলা বিক্রি নিষিদ্ধ। তাদের খাদ্য নিয়ন্ত্রকরা ঐ মশলায় উচ্চ পরিমাণে ইথিলিন অক্সাইড খুঁজে পেয়েছেন। এটা ক্যান্সার সৃষ্টিকারী। ঐসব দেশ তাদের নাগরিকদের এসব পণ্য ব্যবহার না করার পরামর্শ দিয়েছেন।

১৪৯৮ সালে সমুদ্রযাত্রার সময় পর্তুগিজ অভিযাত্রী ভাস্কো দা গামা ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে বিভিন্ন ধরনের মশলা নিয়ে যান ও বিশ্ববাসীকে ঐ অতুল প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের খবর দেন। আজ আমরা কি খবর দেব? বিষ বিষ আর বিষ!

লেখক অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞানের শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

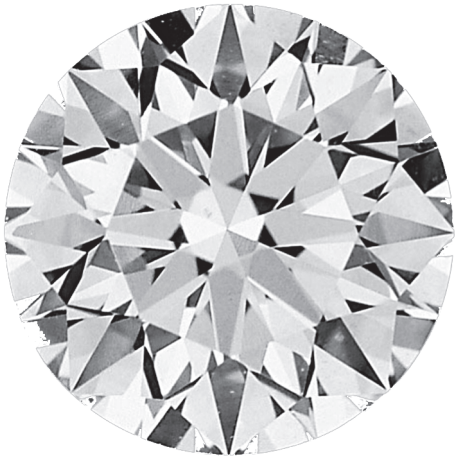
email: asimkrbasak@gmail.com • M. 9432773785

শামীম হক মণ্ডল

হীরের তারা লুসি

জনপ্রিয় রক ব্যান্ড, বিটলস ১৯৬৭ সালের মার্চে 'লুসি ইন দ্য স্কাই উইথ ডায়মন্ডস' নামক একটি গান রেকর্ড করে। জন লেননের কালজয়ী সে লিরিক্স! প্রকাশের কয়েক মাস পরেই হিট। লেনন গানটির ধারণা পান ছেলে, জুলিয়নের আঁকা একটি তরুণীর পোট্রেট থেকে। ছবিতে, যাঁর দ্যুতি হীরের মত চমকাচ্ছিল। এদিকে হার্ভার্ড-স্মিথসোনিয়ান সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ২০০৪ সালে সন্ধান পান সব চেয়ে বড় প্রাকৃতিক হীরের। বিটলস এর লিরিক্স এ প্রভাবিত হয়ে তাঁরা এই বিরাটকার হীরার নাম দিলেন লুসি। কোথায় পেলেন তাঁরা এই লুসিকে? মহাকাশে। এটি একটি মৃতপ্রায় তারা। প্রকৃতিতে এমন তারার সংখ্যা অনেক। এরা আদতে হচ্ছে শ্বেত বামন নক্ষত্র বা হোয়াইট ডোয়ার্ফ।

বিজ্ঞানী মহলে V886 সেঞ্চুরি বা BPM 37093 নামে পরিচিত এই লুসি প্রায় ৪০০০ কিমি ব্যাসার্ধ জুড়ে বিস্তৃত। কি ভাবছেন কতই বা ওজন হবে হীরক খন্ডটার— কয়েক হাজার ক্যারাট? না... দশ বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ক্যারাট! দোকানে হীরের গয়না কিনতে গেলে সামান্য ০.৩ ক্যারাট সিঙ্গল কাট হীরের জৌলুস দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যায়— আর বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ক্যারাট! কেমন জ্বলজ্বল করবে এ অরূপ রতন? বিজ্ঞানীদের ধারণা, এর দ্যুতি এতো বেশী যে পৃথিবী থেকে পঞ্চাশ আলোকবর্ষ (এক বছরে আলো যত দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে) দূরে অবস্থিত 'সেন্টোরাস' নামক নক্ষত্রমণ্ডল থেকেও দেখতে পাওয়া যাবে। ২০০৪ সালে মহাশূন্য থেকে আসা এক ক্ষীণ গুঞ্জন পরিলক্ষিত হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের রাডারে, সেখান থেকে তাঁরা অনুমান করেন যে এটি একটি সাদা বামন-বিশালাকার নক্ষত্রের অবশেষ মাত্র, যার পৃষ্ঠদেশ কেলাসে জমাট বেঁধে পরিণত হয়েছে আস্ত এক হীরেতে।



এর প্রায় শত বছর আগে, ১৯০৫ সালে ৩১০৬ ক্যারেটের কুলিনান নামক এক হীরের সন্ধান মেলে সাউথ আফ্রিকার প্রিটরিয়াতে। লুসির আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত এটিই ছিল পৃথিবীর সবথেকে বড় হীরে। এই কুলিনানকে অনেকগুলো টুকরো করে রাখা ছিল যার মধ্যে কুলিনান ১ নামক টুকরোটি সব থেকে বড়, ৫৩০ ক্যারেটের, যার বাজারমূল্য কয়েকশ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। এই কুলিনান ১ হচ্ছে বর্নহীন হীরে। এছাড়া পৃথিবীর বৃহত্তম রঙিন হীরা হল 'গোল্ডেন জুবিলি', যার ওজন ৫৪৫.৭৬ ক্যারেট, আকারে এটি গল্ফ বলের চেয়ে সামান্য বড়। সেখানে লুসি আকারে চাঁদের থেকেও বড়। আমরা জানি, হীরের ঔজ্জ্বল্য অনেকটা নির্ভর করে কাটিং এর ওপর। লুসির মত অতিকায় হীরেকে ঠিকঠাকমতো গ্রেড করতে গেলে সূর্যের সমান জুয়েলারীর দোকান বানাতে হবে! ভাবা যায়। আর দাম— সে আর হিসেব করে কাজ নেই। মরা হাতির দাম লাখ টাকা জানতাম আমরা, আর এ যে মৃতপ্রায় তারার দাম কোটি বিলিয়ন ডলার!

২০০৪ সালেরও আগে ১৯৯২ তে একবার এই বামন নক্ষত্রের আভাস পেয়েছিলেন হার্ভার্ড-স্মিথসোনিয়ান সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের বিজ্ঞানীরা। তখন শুধু 'ক্রিস্টালাইজড কার্বনের একটি অংশ' হিসাবেই অনুমান করেছিলেন তাঁরা। পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন লুসির কেন্দ্রের তাপমাত্রা কমে ৬৬০০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নীচে নেমে যাওয়ায় লুসি থেকে স্পন্দিত আভা নির্গত হচ্ছে ক্রমাগত। তারার কেন্দ্র হরেক রহস্যে মোড়া। একদম প্রাথমিক অবস্থায় (উত্তাপ যখন খুব বেশী থাকে) তারার হেঁশেল সামলায় হাইড্রোজেন, হিলিয়াম প্রভৃতি হাল্কা নিউক্লিয়াসরা। তাদের সংযোজনে একে একে তৈরী হয় কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ভারী পরমানুর নিউক্লিয়াস। উষ্ণতার হেরফেরে, নক্ষত্র থেকে নির্গত আভা বা বর্ণালির চরিত্র বদলায় প্রতিনিয়ত। হাজার হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত তারাগুলোকে ছোঁয়া যায় না, তাদের হাল হকিকত, গঠন বুঝতে গেলে বর্ণালি বিশ্লেষণ ছাড়া কোনো উপায় নেই। বিজ্ঞানে এই সব চর্চার একটা গালভারি নাম আছে- অ্যাস্টেরোসিসমোলজি। নামটা একটু খটমট লাগলেও আমরা হয়ত সিসমোলজি (এই বিষয়ের পণ্ডিতরা পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ কেন্দ্র অধ্যয়ন করে খুঁজে বার করেন ভূমিকম্পের কারণ) সম্পর্কে আগে থেকেই পরিচিত। লুসির ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সময় বুঝতে পেরেছিলেন যে নক্ষত্রের কেন্দ্রটি ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে হীরাতে। তারপর বেশ কতকগুলো পরস্পর পরীক্ষায় দেখা গেছে কেন্দ্রের কার্বন পরমাণুগুলোর পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ায় প্রায় ৯০% নিউক্লিয় ভর পরিণত হয়েছে জমাটবদ্ধ হীরের কেলাসে।

শ্বেত বামন আদতে মৃত নক্ষত্রের অবশেষ এবং এদের কেন্দ্রগুলো খুব ঘন, যেটি সাধারণত কার্বন ও অক্সিজেন দিয়ে ঠাসা। কোটি কোটি বছর ধরে সময়ের সাথে সাথে নক্ষত্রের কেন্দ্রের উষ্ণতা কমে শীতল হয়, ফলে উত্তপ্ত তরল পদার্থ জমে পরিণত হয় কঠিনে। আবার উপরি পাওনা হিসাবে মেলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রচন্ড চাপ। এ দুয়ের প্রভাবে কেন্দ্রের অধিকাংশ কার্বন পরিণত হয় কেলাসে। মানে পুরো প্রক্রিয়াটা পৃথিবীতে হীরা গঠনের মতোই আর কি! কোনো একদিন, অধিকাংশ মৃতপ্রায় নক্ষত্রেরা কি পরিণত হবে হীরক খন্ডে? এ প্রশ্ন আরো উসকে দেয় এক বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কথায়—আমরা পৃথিবীতে হীরা এবং উল্কাপিণ্ডের নমুনায় ন্যানো-হীরের প্রমাণ দেখেছি এবং লুসির আবিষ্কার তারার মধ্যে হীরার সম্ভাবনার দিকে নির্দেশ করে।' আর এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী, বরকারের ভাষায় 'একটি তারার দীর্ঘ জীবনের পরিসমাপ্তি একটি বিশাল উল্লেখযোগ্য ও কাব্যিক ঘটনাও বটে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে, এখন থেকে বিলিয়ন বছর পরে আমাদের চির পরিচিত সূর্য পরিণত হতে পারে বিশাল এক হীরকখন্ডে!'

হীরের রাজ্যে সর্ববৃহৎ হলেও লুসি একা নয়। পৃথিবী থেকে প্রায় ৯০০ আলোকবর্ষ দূরে PSR J2222-0137 নামক একটি কেলাসকার শ্বেত বামনের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা, যার বয়স ১১ মিলিয়ন। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অনুমান এটি মিল্ক ওয়ে গ্যালাক্সির চেয়েও পুরানো! 'কাউন্ট টু এ ট্রিলিয়ন' নামক এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী লিখেছিলেন জন সি. রাইট, সেখানে তিনি সর্বপ্রথম হীরক তারার কথা উল্লেখ করেন, এবং আশা করেন যে অদূরেই মানুষ আন্তঃনাক্ষত্রিক অভিযানে বেরোবে।

হীরক তারা নিয়ে কত গান, কত কবিতা, কত উপন্যাস! এক কথায় সৃষ্টিশীল মনকে বারবার টেনেছে এই মায়াবি শ্বেত বামন নক্ষত্র। লুসি, আমাদের থেকে অনেক দূরের একটি গ্যালাক্সিতে অবস্থিত, অথচ সুদূর অতীত থেকে আজও উজ্জ্বল ভাবে জ্বলজ্বল করছে। এবং ভবিষ্যতেও কোনো মহাকাশ প্রেমী চাইলে দেখতে পাবে যে লুসি মিটমিট করছে।

লেখক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিচার সহায়ক বিজ্ঞান পরীক্ষাগারের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে কর্মরত এবং আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউক্লিয়ার অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের গবেষক

email: shamimmondal709@gmail.com • M. 000

চিঠি-১

সম্পাদক, বিজ্ঞান অন্বেষক

বিজ্ঞান অন্বেষকের মার্চ-এপ্রিল ২০২৪, সংখ্যাটি পড়ে বেশ ভালো লাগল। বিশেষ করে কিছু প্রবন্ধ মনকে বেশ গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ড. বরুন কুমার দত্তের 'কোয়ান্টাম তত্ত্ব-এক ঝলকে' প্রবন্ধটিতে একটি কঠিন বিষয় যথেষ্ট সহজ আর সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। মনের জট অনেকটা কেটেছে। তবে এই বিষয় নিয়ে যদি লেখকের কোন আলোচনা সভার আয়োজন করা যায় সেই আশায় রইলাম।

'একিলিস ও কচ্ছপের গল্প' একজন গণিত শিক্ষিকার কাছে অবশ্যই আগ্রহের বিষয়। লেখককে এটি কৌতূহলী প্রশ্ন 'একিলিস' যদি নিজের গতিবেগ বাড়ায় আর কচ্ছপের গতিবেগ একই থাকে তাহলে কি হবে? পল্লব রায়গুপ্তের 'রঙ চঙে বিজ্ঞান' প্রবীর বসুর 'মোটরগাড়ি বনাম সাইকেল' কোনটি ছেড়ে কোনটির কথা বলা যায়? সংখ্যাটির জন্য অনেক ধন্যবাদ। যেহেতু পত্রিকার পাঠককুলের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরাও আছে, তাই শুধু পড়া ছাড়াও তাদের অংশগ্রহণের কোন অবকাশ পত্রিকায় রাখার কথা ভাবা যেতে পারে।

অংকিতা সেনগুপ্ত, গণিতের শিক্ষিকা

email: ankitasengupta57@gmail.com

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান

রি ং কু দা স

জলের প্রতিসরাঙ্ক

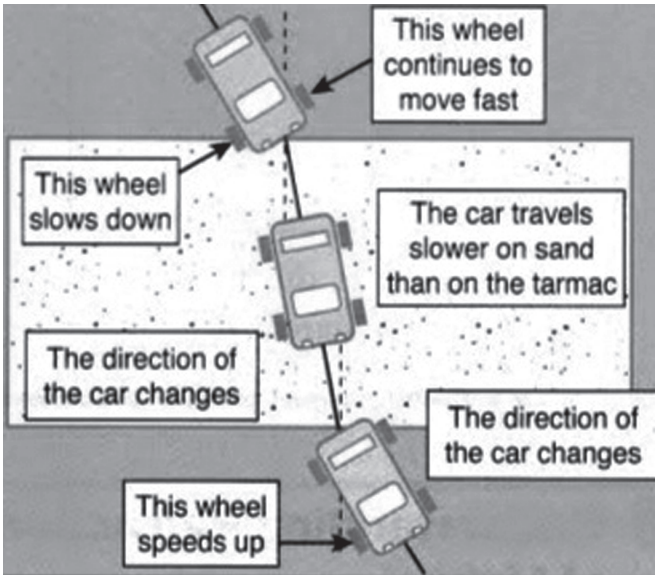
সহজ উপায়ে জলের প্রতিসরাঙ্ক কিভাবে মাপা যায়?

মনে কর বন্ধুরা, একটা চার চাকা গাড়ি একটি পিচ দেওয়া রাস্তা থেকে একটি বালির রাস্তায় কিছুটা তির্যকভাবে প্রবেশ করছে। এই অবস্থায় গাড়ির সামনের চাকা দুটি কি একসাথে (একই বেগে) পিচ দেওয়া রাস্তা থেকে বালির রাস্তায় ঢোকে? না, সামনের একটি চাকা যখন বালির রাস্তায় ঢুকে যায় তখন সামনের অন্য চাকাটি পিচ দেওয়া রাস্তায় থাকে।

এর ফলে গাড়িটির সামনের দুটি চাকার বেগ আলাদা হয়।

ফলে গাড়িটি পিচ দেওয়া রাস্তায় যে দিক বরাবর যাচ্ছিল সেই দিক থেকে কিছুটা বেঁকে যায়।

আলোর ক্ষেত্রেও এইরকম একটি ঘটনা ঘটে যখন আলো এক মাধ্যম থেকে অন্য একটি মাধ্যমে তির্যকভাবে প্রবেশ করে, এই ঘটনাটিকে



পিচ বাঁধানো রাস্তা থেকে বালির রাস্তায় প্রবেশের সময় গাড়িটি বেঁকে যায়।

পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় আলোর প্রতিসরণ বলা হয়। এখানে মাধ্যম বলতে বায়ু, কাঁচ, জল, তেল ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে। এই মাধ্যম গুলির প্রত্যেকটিতে আলোর বেগ আলাদা হয়। শূন্য বা বায়ু মাধ্যমে আলোর বেগ সব থেকে বেশি আর অন্য মাধ্যমগুলিতে আলোর বেগ শূন্য বা বায়ুর মাধ্যমের তুলনায় তুলনামূলকভাবে কম হয়।

তাই বায়ু মাধ্যম থেকে জলে অথবা জল থেকে বায়ু মাধ্যমে আলো যাওয়ার সময় কিছুটা বেঁকে যায় বা বলা ভালো ওর প্রাথমিক দিক থেকে কিছুটা সরে যায়। এই প্রতিসরণের ফলে আলো কতটা বাঁকে, তা মাপতে আমরা পদার্থবিজ্ঞানে একটি রাশি ব্যবহার করি তাকে বলে 'প্রতিসরাঙ্ক'।

একটি নির্দিষ্ট বর্ণের আলোকরশ্মির জন্য কোন একটি নির্দিষ্ট মাধ্যমের (বায়ুর সাপেক্ষে) 'প্রতিসরাঙ্ক' জানা থাকলে অংক করে বলা যায় ওই মাধ্যমে যাওয়ার সময় আলো কতটা বাঁকবে। বায়ুর সাপেক্ষে জলের প্রতিসরাঙ্ক ১.৩৩ আবার বায়ু সাপেক্ষে কাঁচের প্রতিসরাঙ্ক ১.৫, অর্থাৎ বায়ু থেকে জলে যাওয়ার সময় আলো যতটা বাঁকে বায়ু থেকে কাঁচে যাওয়ার সময় আরো বেশি বাঁকে।

তোমরা বাড়িতে বসেই সহজ কয়েকটা উপকরণের সাহায্যে জলের প্রতিসরাঙ্ক মাপতে পারো। এজন্য তোমাদের লাগবে একটা লেজার আলো, একটা প্লাস্টিকের স্বচ্ছ আয়তঘনক আকৃতির বাক্স (যার মধ্যে জল ভরা যাবে) আর সাদা পৃষ্ঠা চাঁদা, পেন্সিল এইসব আর কি...

প্রথমে জলের বাক্সের উপর একটি নির্দিষ্ট কোণে লেজারটিকে ফেলতে হবে, এর থেকে আপতন কোণ পাওয়া যাবে। তারপর জল মাধ্যমে লেজারের গতিপথটি খুব ভালোভাবে চিহ্নিত করতে হবে এখান থেকে জল মাধ্যমে আলোর প্রতিসরণ কোণটি সঠিকভাবে নির্ণয় করা যাবে। এরপর দশম শ্রেণীতে তোমরা আলোর প্রতিসরণ সংক্রান্ত যে স্নেলের সূত্রটি পড়েছিলে সেটির সাহায্যে জলের প্রতিসরাঙ্ক নির্ণয় করা যাবে।

লেখক বিজ্ঞানের শিক্ষিকা, বিজ্ঞান প্রচারক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: sunandarinkudas@gmail.com • M. 9163948267

খাবার নিয়ে ভাবুন

প্রবীর বসু

আটার ভূসি কেন খাবেন?

রুটি, পরোটা, লুচি আমাদের সকলের বাড়িতেই সকালের জলখাবার বা রাতের খাদ্যতালিকায় সগর্ব উপস্থিতি। যদিও রুটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে। শহরের লোকেদের কম-বেশি রুটি প্রিয়। গ্রামাঞ্চলের মানুষ এখনও দুবেলা ভাতের উপরই নির্ভর করে। নরম-গরম সাদা ফুলকো ফুলকো রুটিতো প্রায় সকলেরই পছন্দ। তবে আজকাল চিকিৎসকেরা বিভিন্ন কারণে লুচি, পরোটা ছেড়ে রুটি খাওয়ার পরামর্শ দেন। তবে লুচি, পরোটা খাদ্যতালিকায় নিয়মিত না হলেও একেবারে ব্রাত্য নয়।

সাধারণভাবে রুটি, পরোটা বা লুচি যাইহোক না কেন গৃহিণী প্রথমেই আটা চেলে নেন। চালা আটা ব্যবহার করা হয় খাবার তৈরিতে। চালনিতে অবশেষে পড়ে থাকে ভূসি। তুচ্ছ তাচ্ছিল্য অবহেলা ভরে যার জায়গা হয় আস্তাকুড়ে। কিন্তু যে অবহেলায় এই ভূসি ফেলে দেওয়া হয় তার কিন্তু গুণ অপরিসীম।

ভূসির সত্যিই বহুগুণ। ভূসিতে আছে স্টার্চ (কার্বহাইড্রেট), সেলুলোজ তন্তু, অধিক মাত্রায় প্রোটিন এবং বিভিন্ন প্রকার খনিজ লবণ। এই খনিজ লবণ বলতে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, আয়রন এবং ফসফরাস। ভূসিতে খনিজ লবণের একত্রিত মাত্রা প্রায় ২০ শতাংশ। ভূসিতে সব থেকে বেশিমাত্র থাকে তন্তু (সেলুলোজ) প্রায় ৪২ শতাংশ। স্টার্চ ও প্রোটিনের ভাগ যথাক্রমে ৩০ শতাংশ এবং ১২ শতাংশ। তাই আটা চেলে ভূসি ফেলে দেওয়া সত্যিই বোকামি। আটা চেলে ভূসিকে বাদ দিয়ে যে সব খাবার তৈরি হয় তাতে ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়ামের ঘাটতি দেখা যায় অনেকটাই। ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমে প্রায় ৫০ শতাংশ। পটাসিয়ামের মাত্রা প্রায় ৮০ শতাংশ কমে যায়। কমে আয়রনের মাত্রাও প্রায় ৬০ শতাংশ। এছাড়া ভূসিতে থাকে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স।

গমের ভূসির বিশেষত্ব হল এর উপাদান বিশেষ করে এর তন্তুর বৈশিষ্ট্য। গমের ভূসির তন্তু অন্যান্য তন্তুর চেয়ে খাদ্যদ্রব্যের পচন রোধে অনেক বেশি কার্যকরি। এছাড়া এই তন্তু থেকে যে কার্বহাইড্রেট পাওয়া যায় তার এক-তৃতীয়াংশ শরীরে শোষিত হয়। গমের ভূসিতে থাকা প্রোটিন সহজেই নিয়োজিত হতে পারে দৈহিক গঠনে। পুষ্টি বিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্রতিদিন প্রত্যেক লোকের ৩০ গ্রামের মতো তন্তুর প্রয়োজন। যা আপনি কোনো পয়সা খরচ না করেই রুটি, লুচি বা পরোটার জন্য ভূসি মিশ্রিত আটা ব্যবহার করেই পেতে পারেন। আটার সাথে ফ্রি ভূসির তন্তু অন্তের শক্তি ও সক্রিয়তা বাড়াতে সাহায্য করে।

ভূষির গুণাগুণ কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ভূসিসুদ্ধ রুটি খেলে দূর হয় বহু রোগ। অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণে গমের ভূসি দারুণ কাজে দেয়। গমের ভূসিতে থাকা তন্তুর আধিক্য কোষ্ঠকাঠিন্য রোধে দারুণ উপকারি এই সেলুলোজ শরীর থেকে মলকে নিষ্ক্রান্ত হতে সাহায্য করে। গমের ভূসিতে আয়রনের প্রাচুর্য থাকায় অ্যানিমিয়া রোগীদের ভূষিসুদ্ধ আটার খাদ্যবস্তু গ্রহণে ভালো কাজ দেয়। এছাড়া ভূসিতে থাকা প্রোটিন ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ও বিভিন্ন প্রকার খনিজ লবণ মানুষের পক্ষে ভালো ফল দেয়। যক্ষ্মা বা টিবি রোগে স্নায়ুবিক দুর্বলতায়, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে গমের ভূসি কার্যকরি ভূমিকা পালন করে। ভূসিতে ক্যালসিয়ামের আধিক্য হাড়, দাঁতের গঠন মজবুত করতে এবং শিশুদের দৈহিক বিপাকে সহায়ক হয়। পটাসিয়ামের আধিক্য দেহে অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্যকে যথাযথভাবে বজায় রাখে।

ভূসির এত গুণ সত্ত্বেও সে কিন্তু অবহেলার বস্তু। অথচ ভারতের মতো দেশে যেখানে অধিকাংশ লোক অপুষ্টির শিকার সেই অপুষ্টির মোকাবিলায় ভূসিসুদ্ধ আটার খাদ্যবস্তু বিনা খরচে এক দারুণ টোটকা।

চিঠি-২

সম্পাদক সমীপেষু,

আপনাদের মার্চ-এপ্রিল ২০২৪ সংখ্যায় ড. বরুণ কুমার দত্তের লেখা, যার শীর্ষক 'কোয়ান্টাম তত্ত্ব-এক ঝলকে', সম্বন্ধে কিছু মতামত জানাতে ইচ্ছুক। লেখাটি অত্যন্ত মনোগ্রাহী। কিছু কিছু স্থানে কয়েকটি ধারণাকে বলিষ্ঠ করার অভিপ্রায় থেকে আমার মতামতগুলো লিখলাম :

Louies de Broglie-এর সঠিক উচ্চারণ লুই দ্য ভয় অথবা ব্রয়।

মহাবিশ্বের বিভিন্ন আলোক উৎসের থেকে আসা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গকে রেখা বর্ণালীর উৎপত্তির ব্যাখ্যা করার জন্য পারমাণবিক বিজ্ঞান সবথেকে বেশি সমৃদ্ধ হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। Quantum Mechanics-এর দ্বারা আমরা কোন পরমাণুর বিভিন্ন শক্তিস্তরের শক্তি পরিমাপ করতে পারি। এইভাবে কোন Hydrogen পরমাণুর বিভিন্ন শক্তিস্তরের শক্তি, আবার ঐ স্তরের কৌণিক ভরবেগ ইত্যাদি পাওয়া সম্ভব। যা পরীক্ষালব্ধ ফলের সাথে মেলে। এই শক্তি পরিমাপ থেকেই, তড়িৎ অথবা চৌম্বক ক্ষেত্রে থাকা একটি পরমাণুর সম্বন্ধে আরও অনেক বেশি জানতে পারি।

আমরা পরীক্ষাগারে কণার বিভিন্ন শক্তিস্তরে থাকার সম্ভাবনা করতে পারি। Large Hadron Collider (LHC)-কে যে Higgs particle অর্থাৎ 'ঈশ্বর কণা' আবিষ্কার হয়েছে, তার ভর নির্ধারণ করা হয়েছিল শক্তি পরিমাপ করেই। এই নির্ধারণে Quantum Mechanics এবং Einstein-এর বিশেষ আপেক্ষবাদ, দুটোই ব্যবহৃত হয়।

Heisenberg-এর অনিশ্চয়তা নীতিতে $\Delta r \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$, Δx এবং Δp যে অর্থে ব্যবহার হয়, তা শক্তি সময় অনিশ্চয়তা নীতিতে $\Delta E \Delta t \geq \frac{h}{4\pi}$, ΔE এবং Δt অর্থের থেকে ভিন্ন।

Schrödinger প্রথমে Einstein-এর বিশেষ আপেক্ষবাদের সাহায্যে, লুই দ্য ভয়ের বস্তুতরঙ্গের সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যার সাহায্যে Hydrogen পরমাণুর রেখা বর্ণালী ব্যাখ্যা করা যাবে। কিন্তু এই চেষ্টায় বিফল হওয়ায় ১৯২৬ সালে, কণার গতিকে আলোর গতির তুলনায় অতি নগণ্য ধরে, তিনি তাঁর সমীকরণকে প্রতিষ্ঠা করেন।

তথ্যসূত্র :

1. https://www.youtube.com/watch? v = k451ZDkg2Pg
2. Klein Gordon Equation : Wikipedia

ড. দেবমাল্য মুখোপাধ্যায়
email: debphys.qft@gmail.com • M. 8017586403

রিঙ্কু দাস

জানো কি?

❑ একজন সুস্থ মানুষের শরীরে তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস (৯৮.৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট), কিন্তু পরিবেশের তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার আশেপাশে থাকলেও আমাদের অস্বস্তি হয়। এরকমটা কেন হয় বলোতো?

এ বিষয়ে উত্তর দেবার আগে তোমাদের দুটো বিষয় বলে দিই। ১. জল যেমন উঁচু থেকে নীচের দিকে প্রবাহিত হয় ঠিক তেমন তাপও উষ্ণ বস্তু থেকে শীতল বস্তুর দিকে প্রবাহিত হয়। কখনও উল্টোটা হয় না। আর দুটো বস্তুর উষ্ণতা একই হলে তাপের প্রবাহ হয় না। ২. পরিবেশ থেকে তাপ আমাদের শরীরে প্রবেশ করলেই আমাদের গরমের অনুভূতি হয়। এজন্য গরমকালে পরিবেশের তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হলে আমাদের তাপ ঢোকে, আর গরম বোধ হয়। আর শরীর থেকে তাপ পরিবেশে ছড়িয়ে পড়লে আমাদের শীতল অনুভূতি হয়। এর জন্য শীতকালে পরিবেশের তাপমাত্রা দেহের তাপমাত্রার তুলনায় কম হওয়ায় দেহ থেকে তাপ ছড়িয়ে পড়ে। তাহলে বুঝতেই পারছ শরীর এবং পরিবেশের তাপমাত্রা একই হলে তাপের কোন প্রবাহ হবে না। অর্থাৎ শরীর এবং পরিবেশের তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে শরীর থেকে তাপের কোন প্রবাহ হয় না।

আসলে আমাদের শরীরের প্রতিটা কোষে প্রতিনিয়ত রাসায়নিক বিক্রিয়া হওয়ায় তাপ উৎপন্ন হয় এবং ঐ তাপটা বিভিন্ন পদ্ধতিতে শরীর থেকে নির্গত হয়। তিনটি পদ্ধতিতে পরিবেশের তাপ ছড়িয়ে পড়ে।

১. **বিকিরণ :** এই পদ্ধতিতে তাপ অবলোহিত তরঙ্গের আকারে উষ্ণ বস্তু (এক্ষেত্রে শরীর থেকে শীতল বস্তুতে (পরিবেশে) ছড়িয়ে পড়ে।)

২. **পরিচলন :** শরীরের সংস্পর্শে থাকা বায়ু বা জলের অণুগুলি শরীর থেকে তাপ পরিবাহিত করে। বায়ুপ্রবাহ হলে পরিচলন প্রক্রিয়ায় বেগ বৃদ্ধি পায় এবং আরাম লাগে।

৩. **বাষ্পায়ণ :** এই পদ্ধতিতে শরীর নিজেকে ঠান্ডা রাখার জন্য কিছুটা জলকে ঘাম হিসাবে বের করে দেয়।

বাষ্পে পরিণত হওয়ার সময় শরীর লীনতাপ নেয়। ফলে শরীর ঠান্ডা বোধ করে। আমাদের শরীরের একটা তাপীয় আরাম অঞ্চল (Thermal Comfort Zone) আছে।পরিবেশের তাপমাত্রা ২২ থেকে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকলে এবং বায়ুতে উপস্থিত জলীয়বাষ্পের পরিমাণ ৪০-৬০% হলে আমাদের শরীরে আরাম বোধ করে। এই সময়ে শরীরে উৎপন্ন তাপ খুব সহজেই উপরের তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে বেরিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু পরিবেশের তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার নীচে ২-৩ ডিগ্রি কম থাকলেও শরীর থেকে তাপ ক্ষয়ের এই প্রক্রিয়াগুলি কাজ করে না। শরীরে উৎপন্ন তাপ শরীরের মধ্যেই থেকে যায়। ফলে আমাদের শরীরে একটা অস্বস্তি থেকে যায়।

লেখক বিজ্ঞানের শিক্ষিকা ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

M. 9163848267

সন্তোষ সেন

পত্রপ্রতিবেদন

❑ কল্যাণীর সান্যালচরে নদীপাড়ে ভাঙন চওড়া হচ্ছে।

তথ্য বলছে বিগত ২০ বছরে এই অঞ্চলে প্রায় ৮ হাজার বিঘার বেশি জমি গ্রাস করেছে ভাগীরথী নদী। যেটুকু এখনো টিকে আছে তা আগামী দিনে রক্ষা পাবে তো, গ্রামের ভবিষ্যতেই বা কী?

তথ্য আরো বলছে শেষ ২০ বছরে এই এলাকায় ৭টি গ্রামসংসদ নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। ১৩টি সংসদের মধ্যে এখন টিকে রয়েছে মাত্র ছটি গ্রামসংসদ। অন্যদিকে ২০২০ সালে যেখানে ভোটার সংখ্যা ছিল ১১ হাজার, বর্তমানে তা কমে হয়েছে হাজার পাঁচেক।

ভোট আসে, চলেও যায়। রং বদলায় কিন্তু মানুষের সমস্যার চালচিত্র বদলায় না। গ্রামের মানুষ প্রচন্ড ক্ষোভে ফুঁসছেন। গ্রামবাসীদের বক্তব্য—"নদীতে জল বাড়লেই ভয় হয়। এই বুঝি গ্রামের অবশিষ্ট অংশ তলিয়ে যাবে নদীগর্ভে। তাই বর্ষার সময় রাতে দুচোখের পাতা এক করতে পারি না। নদীপাড়ের বাসিন্দারা বলছেন ভোট তো ৫ বছর আগেও দিয়েছিলাম, নদী ভাঙ্গন রোধ হল কই? মাঝেমধ্যে বালির বস্তা দিয়ে সেচ দপ্তরের বাবুরা ভাঙ্গন রোধের চেষ্টা করেন, তাতে কি আর ভাঙ্গন আটকানো যায়?"

স্থানীয় এক বাসিন্দা বাসুদেব হালদারের কণ্ঠে ক্ষোভ আশঙ্কা হতাশার ছাপ স্পষ্ট—"বাপ ঠাকুরদার ভিটে, জমি ছিল এই গ্রামেই। ৮ বছর আগে সেই জমি গিলে খেয়েছে নদী। ওই রাতের কথা আজও ভুলতে পারি না। প্রথমে বাড়ির উঠোন, তারপর রান্নাঘর, শেষ পর্যন্ত বসতভিটে। কিছুই বাঁচাতে পারিনি। শেষ বয়সে কোনমতে গ্রামের এক কোণে মাথা গোজার ঠাঁই করে নিয়েছি।"

নদীয়া-মালদা-মুর্শিদাবাদের ব্যাপক অঞ্চলে ভাগীরথীর দুই পাড় বরাবর চিত্রগুলো একই, কোথাও আরও ভয়াবহ। আসলে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ করে নানান ধরনের বাধা, বড় জলাধার আর বেআইনি নির্মারণকাজ এবং অবাধে বালি চুরি চললে এইসব তো হওয়ারই কথা, হচ্ছেও তাই। এর সাথে আবার যুক্ত হয়ে গেছে কারখানা ও শহরের দূষিত বর্জ্য সরাসরি নদীতে ফেলা। দূষণ ও অবৈধ নির্মাণের ঠেলায় গ্রামবাংলার নদীগুলো আজ জরাজীর্ণ। নদীগুলো সংস্কার করে আগের অবস্থায়— ফিরিয়ে দেওয়ার আন্দোলন জোরদার হচ্ছে ক্রমশ। অবিরল নির্মল গঙ্গার দাবিতেও পরিবেশ কর্মীদের প্রচার বিকশিত হচ্ছে। গঙ্গা সহ ছোট-বড় নদীগুলোর সমস্যা ও মৎস্যজীবী এবং কৃষকদের সংকট দিন দিন ভয়াবহ হচ্ছে। অতচ বিগত ১০ বছরে নমোমি গঙ্গা প্রককল্পের কোটি কোটি টাকা স্রেফ জলেই গেছে। নদী সংস্কারের কাজে রাজ্য সরকারও প্রায় নীরব নিশ্চুপ।

বিপর্যস্ত মানুষগুলোর কথা, মৎস্যজীবী ও দরিদ্র কৃষকদের কথা কেউ কি ভেবেছেন? দুঃখের বিষয় গত নির্বাচন এবং এবারের নির্বাচনেও পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে কৃষক, মৎস্যজীবী, ক্ষেতমজুর, ভূমিহীন চাষীদের কথা কোন রাজনৈতিক দলের প্রচারে জোরের সাথে উঠে এল না। পরিবেশ সংকটের রাজনৈতিক দলগুলির বক্তব্য দলীয় ইস্তাহারের এক কোণে ঠাঁই পেয়ে থাকলেও তা নিয়ে কার্যকরী প্রচার ও এগুলোকে আজকের দিনের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু করে তোলার বিষয়টি এখনো একরকম অবহেলিত।

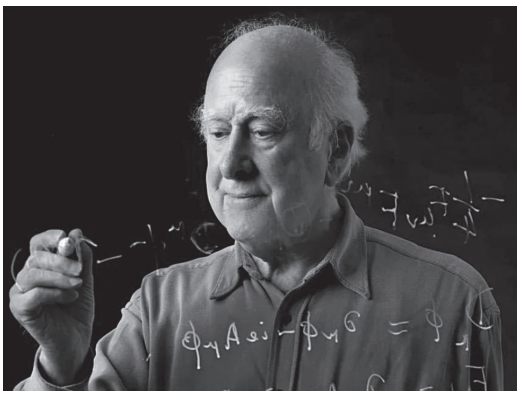
লেখক বিজ্ঞানের শিক্ষক, পরিবেশকর্মী ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

M. 9674468060

স্মরণ

ড. অমিতাভ চক্রবর্তী

চলে গেলেন বিজ্ঞানী পিটার হিগস



তাঁর নাম অনুসারেই কণা পদার্থবিজ্ঞানীদের সাধের স্ট্যান্ডার্ড মডেলে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কণাটির নামকরণ হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা বলেন হিগস বোসোন, গোটা দুনিয়া অবশ্য 'ঈশ্বর কণা' নামেই একে চেনে। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার জ্ঞান অনুযায়ী পদার্থের ভর সৃষ্টির নেপথ্যে কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে হিগস বোসোন তথা হিগস ফিল্ডের।

পিটার হিগসের জন্ম ২৯ মে, ১৯২৯ ইংল্যান্ডের নিউক্যাসেল- আপন-টাইন শহরে। বাবা থমাস হিগস ছিলেন বিবিসি-এর সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার। পিটারের শৈশব কেটেছে ব্রিস্টল শহরে। স্থানীয় যে কোথাম গ্রামার স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন একসময়ে সেখানে পড়াশুনা করেছেন আরেক দিকপাল ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী পল ডিরাক। তারপর সিটি অফ লন্ডন স্কুল হয়ে কিংস কলেজ। ১৯৪৭ সালে পদার্থবিদ্যায় ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জনের পর ১৯৫৪-তে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন হিগস। থিসিসের শিরোনাম ছিল "Some problems in the theory of molecular vibrations"। ১৯৬০ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার পদে যোগ দেন ড. পিটার হিগস। ছাত্রজীবন থেকেই এডিনবরা তাঁর প্রিয় শহর। এই শহরই জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সয়েলের জন্মভুমি, যিনি আবিষ্কার করেছিলেন তড়িৎ ও চৌম্বকত্ব আদতে একই বলের ভিন্ন প্রকাশরূপ। একে তড়িৎচুম্বকত্ব বলে, আলো একপ্রকার তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। ছাত্রাবস্থায় নিউক্লিয় অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও যোগ দিয়েছিলেন হিগস। আন্দোলনের সূত্র ধরেই পরিচয় হয়েছিল জোডি উইলিয়ামসনের সঙ্গে। ১৯৬৩-তে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন ওরা। পরে অবশ্য রাজনীতি ছেড়ে বিজ্ঞানই তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হয়ে ওঠে। ১৯৬৪ সাল নাগাদ ৩৫ বছর বয়সী অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর পিটার হিগস একটি গবেষণা প্রবন্ধে এমন এক কণার অস্তিত্ব সম্পর্কে বলেছিলেন।

সময়টা বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক। হিগস বোসোনের খোঁজে কাজ শুরু হল আমেরিকায়। ৫৪ কিলোমিটার লম্বা সুড়ঙ্গে এই পেল্লায় যন্ত্র বসাতে খরচ ধরা হয়েছিল আনুমানিক ১০০০ কোটি ডলার। কিন্তু কিছুদূর কাজ এগোনোর পরেই অর্থবরাদ্দে পিছু হটল সরকার। দেশের সাধারণ মানুষের করের টাকায় বিজ্ঞানের রহস্য উন্মোচনের যৌক্তিকতা নিয়ে সন্দীহান দেশের কর্তাব্যক্তিরা। সংকটে বিজ্ঞানীদের এই মহাযজ্ঞ। এগিয়ে এলেন নোবেলজয়ী পদার্থবিদ লিওন লেডারম্যান। সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের এই গবেষণার গুরুত্ব বোঝাতে কলম ধরলেন তিনি। বিজ্ঞানসাংবাদিক ডিক টেরেসির সঙ্গে লিখে ফেললেন আস্ত একটা বই। স্ট্যান্ডার্ড মডেল এবং হিগস বোসোনের কথাও সেখানে লিখেছিলেন তিনি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতে অভ্যস্ত বিজ্ঞানী বইটির এমন এক খটোমটো নাম দিলেন যা মোটেই পছন্দ হল না প্রকাশকের। বিরক্ত লেডারম্যান বইয়ের নাম পাল্টে রাখলেন 'The Goddamn Particle'। ইংরাজিতে 'God-damn' কথাটি ব্যবহৃত হয় 'দুত্তেরিছাই' জাতীয় একটা ভাব বোঝাতে। কিন্তু প্রকাশকের বদান্যতায় ওই 'damn' অংশটা বাদ পড়ে বইটি প্রকাশ পায় The God Particle নামে।

বিজ্ঞানী হয়েও বইয়ের নামে 'গড' শব্দটি কেন ব্যবহার করলেন তার দুটি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন লেডারম্যান। একে তো এমন কণাকে শনাক্ত করতে গিয়ে নাজেহাল বিজ্ঞানীদের বানাতে হচ্ছে এক এলাহি কোলাইডার। তাই তিনি বলতে চেয়েছিলেন গড-ড্যাম পার্টিক্যাল। তাছাড়া বইয়ের অষ্টম পরিচ্ছদে তিনি শোনালেন এক কাহিনি, ঠিক যেন বাইবেলে বর্ণিত 'টাওয়ার অফ ব্যাবেল' নির্মাণ পর্বের ঢঙে। সেই যখন এক ভাষা ও এক সমাজের মানুষেরা সবাই হাত লাগাল এক বিশাল মিনার গড়তে, যার চূড়া গিয়ে পৌঁছোবে একেবারে স্বর্গে। মানুষের আকাশ ছোঁয়ার তোড়জোড় দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। নেমে এলেন মর্তে। মানুষের মধ্যে করে দিলেন হরেক রকমের ভাষা। চারদিকে শুরু হল চরম বিশৃঙ্খলা। মিনার তৈরি আর হয়ে উঠলো না। এই ঘটনার প্যারোডি করেই লিখলেন লেডারম্যান। তাঁর কাহিনি অনুযায়ী কণাজগতের বিশৃঙ্খলা দূর করতে স্বয়ং ঈশ্বর মর্তে নেমে মানুষের হাতে তুলে দিতে চাইলেন হিগস বোসোন, যাতে মানুষ সন্ধান পায় এই অপূর্ব সৃষ্টির। প্রকাশক ভাবলেন এমন একটা কণা যা নাকি গোটা ব্রহ্মাণ্ডকে ভরের যোগান দেয়, তার নামের সঙ্গে 'ঈশ্বর' শব্দটি জুড়ে থাকা মানেই তো পাঠকের আগ্রহ অনেকগুণ বাড়িয়ে তোলা! হয়েছিলও তাই। প্রকাশের ঠিক পরেই বেস্টসেলার হয়ে ওঠে বইটি। আর হিগ্‌স বোসোন সাধারণের মনে জায়গা করে নেয় 'গড পার্টিক্যাল' বা 'ঈশ্বর কণা' নামে। যদিও এসব করে বাঁচানো যায়নি সুপারকন্ডাক্টিং সুপারকোলাইডার তৈরির প্রোজেক্টকে। প্রায় ২৪ কিলোমিটার সুড়ঙ্গ খোঁড়ার পর মার্কিন সরকার বাতিল করে দেয় সেই প্রকল্প।

গবেষণার জন্য বিজ্ঞানীদের হাতে তখন সার্নের লার্জ ইলেকট্রন পজিট্রন কোলাইডার (EPL) এবং শিকাগোর ফার্মিল্যাবে টেভাট্রন প্রোটন-অ্যান্টিপ্রোটন কোলাইডার। কিন্তু চাই আরও শক্তিশালী কোলাইডার। ঠিক সেই সময়েই সার্ন লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার (LHC) তৈরির প্রস্তুতি নেয়। অনেক বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে প্রায় পনেরো বছর পর ২০০৯ সালের শেষ দিকে কাজ করতে শুরু করে LHC। পেল্লায় আকারের এই যন্ত্রটিতে হ্যাড্রন জাতীয় কণাদের (যারা কোয়ার্কের সমন্বয়ে তৈরি, যেমন- প্রোটন, নিউট্রন, ইত্যাদি) মধ্যে সংঘর্ষ ঘটানো হয়। LHC-র প্রধান তিনটি অংশ- কোলাইডার, ডিটেক্টর এবং যন্ত্রগণনা (computing)। ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ LHC সুরঙ্গে মাত্র চারটি সুনির্দিষ্ট বিন্দুতে তীব্র গতিশীল প্রোটন-প্রোটন (বা ভারী আয়ন) কণাস্রোত মুখোমুখি ধাক্কা খায়। এই যন্ত্রেই অসাধ্য সাধন করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। ডিটেক্টরের তথ্য বিশ্লেষণ করে ওরা ১২৫ গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট (Ge) শক্তিসম্পন্ন এক ধরনের কণার অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছিলেন, যা চরিত্রে অনেকটা হিগস বোসোনের মতোই। গবেষকদের মতে এই কণাটি হিগস বোসোন হওয়ার সম্ভাবনা ৯৯.৯৯৯ শতাংশ। ৪ জুলাই, ২০১২ যখন সার্নের অডিটোরিয়ামে এই ঘোষণা হচ্ছে তখন অনেক বিজ্ঞানীর সঙ্গে শ্রোতার আসনে বসে স্বয়ং পিটার হিগস। চোখে তাঁর আনন্দাশ্রু। জানালেন "ভাবতে পারিনি আমার জীবদ্দশাতেই এই কণাটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে"। অবশেষে সম্পূর্ণতা পেল পদার্থবিদদের সাধের স্ট্যান্ডার্ড মডেল। ঠিক পরের বছরই পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় পিটার হিগস ও ফ্রাঁসোয়া অয়েংলার-কে। বেঁচে থাকলে হয়তো রবার্ট ব্রাউট-ও সম্মানিত হতেন ওদের সঙ্গে, কিন্তু দুবছর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

১৯৯৬ সালে চাকরি থেকে অবসর নিলেও পিটার হিগস দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে সহকর্মী ও ছাত্রদের সঙ্গে গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন, এমনকি অসমর্থ শরীরেও নিয়মিত পদার্থবিদ্যার কনফারেন্সে যোগ দিতেন। অবশেষে ৮ মার্চ, ২০২৪ এডিনবড়াতে নিজের বাড়িতেই ৯৪ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বিজ্ঞানী।

ড. রাজা রাউত

যারা হারিয়ে যাচ্ছে : নিশাচর প্রাণী

ভারতীয় বনরুই

সাধারণ ইংরাজি নাম : *Indian Pangolin*
বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Manis crassicaudata*



এরা একটি অত্যন্ত দুর্লভ আঁশ যুক্ত ব্যতিক্রমী স্তন্যপায়ী প্রাণী যারা কীটপতঙ্গ, পিঁপড়া এবং উইপোকাকে মাটি থেকে খনন করে এবং এর নখর ব্যবহার করে খায়। এটি শুষ্ক, অনুর্বর এবং মরুভূমি অঞ্চলে ভালভাবে অভিযোজিত; তবে এটি বেশিরভাগ নরম-বালুকাময় স্থলজ আবাসস্থল পছন্দ করে কারণ তা গর্ত খননের জন্য সহজ। প্যাঙ্গোলিন ভারতের অন্যতম পাচার হওয়া স্তন্যপায়ী প্রাণী।

ভারতীয় সজারু

সাধারণ ইংরাজি নাম : *Indian Porcupine*
বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Hystrix indica*



অত্যন্ত দুর্লভ এই প্রাণীটি দক্ষিণ-পশ্চিম এবং মধ্য এশিয়া বরাবর পাওয়া যায়। এগুলিকে নিশাচর হিসাবে বিবেচনা করা হয় কারণ প্রাপ্তবয়স্ক এবং এমনকি কিশোররাও খাবারের সন্ধানে রাতে প্রায় ৬-৭ ঘন্টা ব্যয় করে।তাদের খাদ্য বেশিরভাগই তৃণভোজী এবং এতে পোকামাকড় সহ ফল, সবজি, শিকড় এবং কন্দ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

ভারতীয় দৈত্যাকার উড়ন্ত কাঠবিড়ালি

সাধারণ ইংরাজি নাম : *Indian Giant Flying Squirrel*
বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Petaurista philippensis*



দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ এশিয়ায় পাওয়া যায়, ভারতীয় দৈত্যাকার উড়ন্ত কাঠবিড়ালি নিশাচর। এটি গাছের ক্যানোপিতে জীবনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করে। তারা গাছের গর্তের মধ্যে বাসা তৈরি করে এবং জুন-জুলাই মাসে একটি অন্ধ সন্তানের জন্ম দেয়। এদের খাদ্য বেশিরভাগই সব মৌসুমী ফল এবং মূলের ছাল।

ভারতীয় হেজহগ

সাধারণ ইংরাজি নাম : *Indian Hedgehog*
বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Paraechinus micropus*



দুর্লভ এই প্রজাতি ভারত ও পাকিস্তানের স্থানীয়। এটি প্রধানত বালুকাময় মরুভূমি অঞ্চলে বাস করে। থর মরুভূমি অর্থাৎ গুজরাট, রাজস্থান থেকে পাকিস্তানের একটি অংশ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। তারা ভারতীয় বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন, ১৯৭২ তফসিল I) এর অধীনে সুরক্ষিত।

ভারতীয় নেকড়ে

সাধারণ ইংরাজি নাম : *Indian Wolf*
বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Canis lupus pallipes*



দুর্লভ এই প্রজাতি যা দিনের বেলা লুকিয়ে থাকে এবং ঘুমায় এবং সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত শিকার করে। তারা ৬-৮ জনের দলে বাস করে। এটি IUCN দ্বারা বিপন্ন প্রজাতি হিসাবে বিবেচিত এবং বন্যপ্রাণী, সুরক্ষা আইন, ১৯৭২ এর তফসিল এ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

BIGYAN ANNESWAK VOL : 21 Issue No. 4 July - August 2024 RNI : WBBEN/2003/11192 Rs. 20/-
ISSN 2582-5674

ড. রাজা রাউত

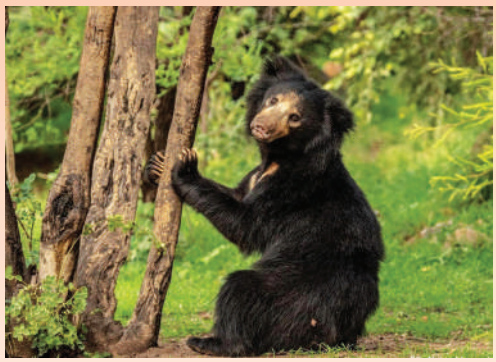
যারা হারিয়ে যাচ্ছে : নিশাচর প্রাণী

নিশাচর প্রাণীরা রাতে জেগে ও সক্রিয় থাকার এবং দিনে ঘুমানোর ক্ষমতার দ্বারা অভিযোজিত হয়ে থাকে। তারা শিকার, সঙ্গী পাওয়া, অঞ্চল স্থানান্তর, দিনের তাপ এড়াতে নিশাচর আচরণ গ্রহণ করেছে। এবং অনেক সময় কোনো মানুষের মিথস্ক্রিয়া এবং ঝামেলা থেকে নিজেকে দূরে রাখতেও এরা হয়তো এরকম আচরণ করে থাকে। এই প্রাণীদের শ্রবণশক্তি, গন্ধ এবং বিশেষভাবে অভিযোজিত দৃষ্টিশক্তির একটি উচ্চ বিকশিত অনুভূতি রয়েছে। সাধারণত, নিশাচর প্রাণীদের চোখে রড কোষের আধিক্য বেশি থাকায় অন্ধকারে পরিষ্কার দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হয় এরা।

এক ঝলকে ভারতের কিছু বিপন্ন নিশাচর

স্লথ ভাল্লুক

সাধারণ ইংরাজি নাম : *Sloth Bear*
বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Melursus ursinus*



এরা International Union for Conservation of Nature (I U C N) লাল তালিকায় ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতি হিসাবে তালিকাভুক্ত। পুরো পশ্চিম ও মধ্য ভারতে বিস্তার বেশি এদের। স্লথ ভালুকও নিশাচর প্রজাতি বিভাগের অধীনে আসে। ভারতের অন্যান্য তিনটি ভাল্লুক প্রজাতি যথা হিমালয়ান ব্রাউন বিয়ার, এশিয়াটিক ব্ল্যাক বিয়ার এবং সূর্য ভাল্লুকের মধ্যে এটি দেশের ভাল্লুকের সবচেয়ে বিস্তৃত প্রজাতি।

ছোট ভারতীয় সিভেট বিড়াল বা ছোট গন্ধ গোকুল বা খটাশ

সাধারণ ইংরাজি নাম : *Small Indian Civet*
বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Viverricula indica*



এরা নিশাচর প্রাণী হিসাবে বিবেচিত। ভারতীয় সিভেট বিড়াল স্থানীয় এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মোটামুটি পরিচিত প্রজাতি। এরা খাদ্য হিসেবে পোকামাকড় ও ফল খায়। তবে তারা ছোট ইঁদুর, পাখি, সাপ এবং কখনও কখনও এমনকি মরদেহও খায়। উল্লেখ্য এদের কাছাকাছি সিভেট পরিবারে আরও বেশ কিছু প্রজাতি রয়েছে যারা সবাই নিশাচর। এরকমই একটি নিকটতম প্রজাতি হলো Asian Palm Civet (Paradoxurus hermaphroditus).

ভারতীয় ডোরাকাটা হায়েনা

সাধারণ ইংরাজি নাম : *Indian stripped Hyaena*
বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Hyaena hyaena*



অন্যান্য হায়েনা প্রজাতির মতো, ভারতীয় ডোরাকাটা হায়েনাকেও ঝাড়ুদার হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাই,গভীর রাতে এদের পশ্চিম ও মধ্য ভারতের জঙ্গল ও সংলগ্ন অঞ্চলে সাধারণত দেখা যায়। এই মুহূর্তে ভারতের অত্যন্ত দুর্লভ স্তন্যপায়ী এরা।

মধু ব্যাজার

সাধারণ ইংরাজি নাম : *Honey Badger or Ratel*
বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Mellivora capensis*



এই মধু ব্যাজার যা রেটেল নামেও পরিচিত, আফ্রিকা, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া এবং ভারতে বিভিন্ন বনাঞ্চলে বা সংলগ্ন অঞ্চলে পাওয়া যায়। এটি মূলত মাংসাশী এবং পোকামাকড়, সাপ, ইঁদুর, পাখি, ব্যাঙ এবং ডিম খায়।

email : rajarouthbhbl@gmail.com M. 9474417178